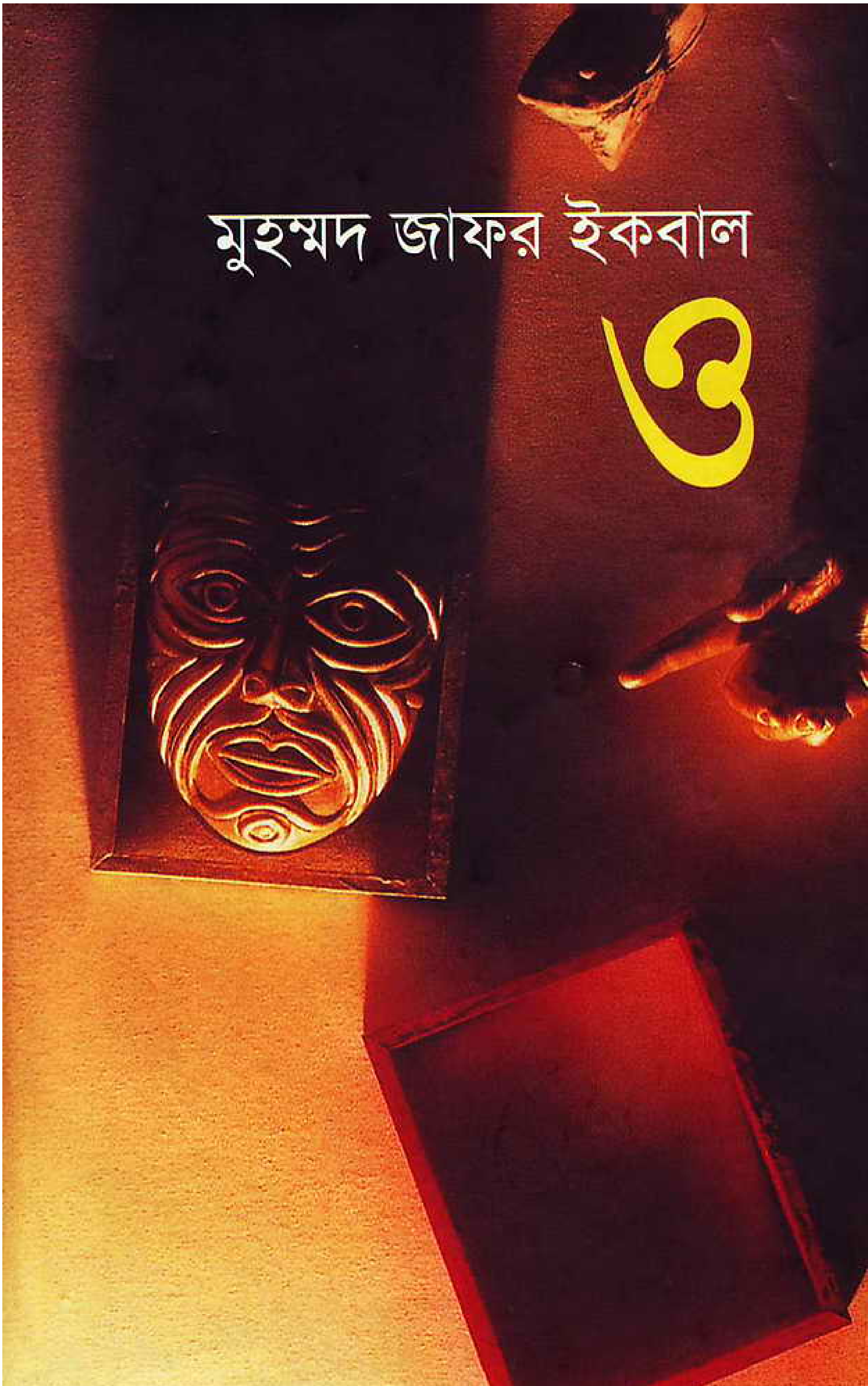
মুহম্মদ জাফর ইকবাল
ও

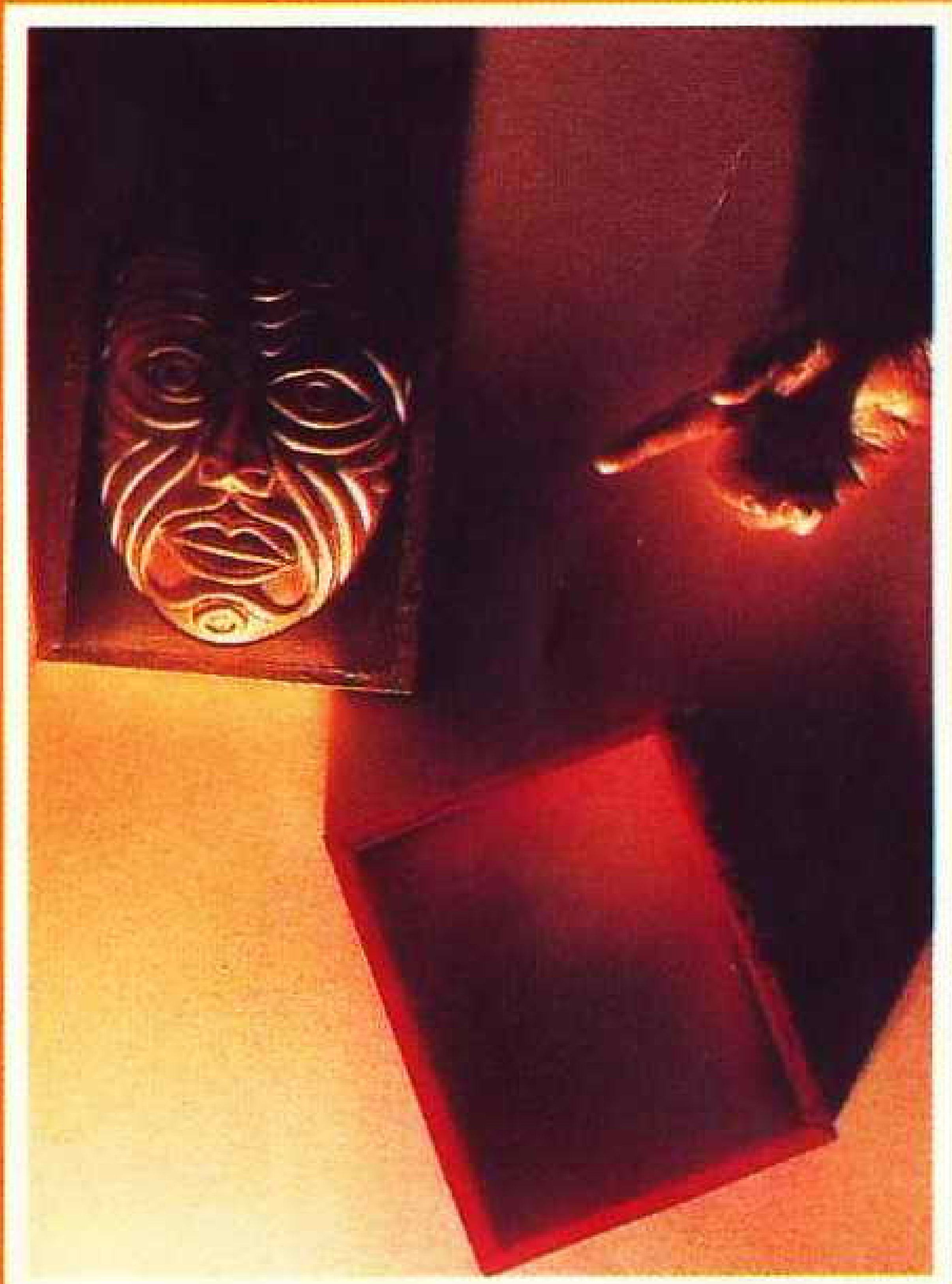

চোয়ালের হাড়গুলো উঁচু হয়ে উঠল, মনে হলো চোখ দুটো কোটর থেকে বের হয়ে আসবে। জিবটা লম্বা হয়ে মুখ থেকে বের হয়ে আসে, মাড়িটা উঁচু হয়ে দাঁতগুলো মুখের বাইরে চলে আসে। মানুষটা সারা শরীর কেমন যেন দুমড়াতে-মোচড়াতে থাকে। আমি ও মতিন ভয়ে আর আতঙ্কে একেবারে পাথরের মতো জমে গেছি নড়তে পারছি না। আমার হাতের হারিকেনটা বারকয়েক দপদপ করে জ্বলে উঠে নিভে গেল। ঠিক নিভে যাওয়ার আগে আমার মনে হলো মানুষটা কুকুরের মতো উঠে বসেছে, তারপর আমাদের দিকে লাফ দিয়েছে।

সূচি

ও / ৯
আলমারি / ২০
মা-মণি / ৩০
মরিয়মের গ্রাম / ৪৪
মড়া / ৬০

৩

গহর মামা আমাদের খুব দূর সম্পর্কের মামা; কিন্তু আপন মামাদের থেকে তাঁর সঙ্গে আমাদের বেশি খাতির ছিল। আমি যখনকার কথা বলছি, তখন ভদ্রতার ব্যাপার-স্যাপারগুলো সেভাবে চালু হয় নি। হাঁচি দিয়ে কেউ "এক্সকিউজ মি" বলত না, চা-নাশতা খেয়ে কেউ "থ্যাংকু" বলত না। পেটভরে খেয়ে সবাই "ঘেউক" করে বিকট শব্দ করে ঢেঁকুর তুলত এবং সে জন্য কেউ তার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাত না। এখন যে রকম কেউ আগে থেকে খোঁজখবর না দিয়ে আসে না, তখন সে রকম ছিল না– আত্মীয়স্বজন দুইটা মুরগি, না হয় এক জোড়া নারকেল নিয়ে রাত-বিরেতে চলে আসত, কেউ কিছু মনে করত না।

আমাদের গহর মামাও সে রকম চলে আসতেন– অন্য কেউ এলে আমরা যেটুকু খুশি হতাম, গহর মামা এলে তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি হতাম। তার প্রথম কারণ গহর মামা খুব সুন্দর গল্প করতে পারতেন। তাঁর নানা রকম গল্প ছিল। কিছু গল্প ছিল খুব হাসির– আজকালকার ছেলেমেয়েরা শুনলে নিশ্চয়ই নাক-মুখ কুঁচকে বলবে, "হাউ ডার্টি", কিন্তু আমরা শুনে হেসে কুটি কুটি হতাম। কিছু কিছু গল্প ছিল বিচিত্র। ডাকাতরা এসেছে এবং গৃহস্থরা কীভাবে সেই ডাকাতদের ধরে ফেলছে– সে রকম মজার গল্প। কিছু কিছু গল্প ছিল ভয়ংকর– গরু চোরদের ধরে কীভাবে খেজুর কাঁটা দিয়ে তার চোখ গেলে দেওয়া হচ্ছে তার বীভৎস বর্ণনা। তবে গহর মামার সবচেয়ে মজার গল্প হচ্ছে ভূতের গল্প। আমরা ভয় পাব বলে ভূতের গল্প বেশি বলতে চাইতেন না, অনেক জোরাজুরি করলে একটা-দুইটা বলতেন; সেগুলো শুনে ভয়ে আমাদের পেটের ভাত চাল হয়ে যেত!

গহর মামার কাছে শোনা একটা গল্প ছিল এ রকম– তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি :

এখন যে রকম নানা ধরনের স্কুল আছে– কোনটা বাংলা, কোনটা ইংরেজি, আমাদের সময় সে রকম কিছু ছিল না। দশ-বিশ মাইলের মধ্যে কোনো স্কুল খুঁজে

পাওয়া যেত না। বেশিরভাগ মানুষ লেখাপড়াই করত না, লেখাপড়ার কোনো দরকারও ছিল না। খুব যদি কারও লেখাপড়ার শখ হতো, সে কোনো মক্তব, না হয় মাদ্রাসায় পড়ত। আমার নিজের লেখাপড়া করার কোনো ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আমার বাবার খুব শখ ছেলেকে মাওলানা বানাবেন। তাই একদিন আমাকে ধরে জোর করে নিয়ে একটা মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দিয়ে এলেন। সেই মাদ্রাসায় থাকা, খাওয়া, লেখাপড়া সবকিছু।

মাদ্রাসার বড় হুজুরের নাম করিমুল্লা। শক্ত পেটা শরীর, মুখে লম্বা দাড়ি, মাথায় সাদা পাগড়ি। বাবা চলে আসার সময় করিমুল্লা হুজুরকে বলে এলেন, "হুজুর আমার ছেলেকে আমি আপনাকে দিয়ে গেলাম।"

হুজুর বললেন, "তোমার কোনো চিন্তা নাই। আমি তোমার ছেলেরে মানুষ করে ফেরত দিব।"

বাবা বললেন, "হুজুর, খালি চামড়াটা দিলেই হবে। আমার ছেলের হাড্ডি আর মাংস আপনার খেদমতের জন্য। মানুষ করার জন্য হাড্ডি-মাংস ছেঁচে ফেলেন, আমার কোনো আপত্তি নাই।"

সেই যুগে সবাই জানত, যে হুজুর যত শক্ত পিটুনি দিতে পারেন তাঁর ছাত্র তত ভালো লেখাপড়া করতে পারে। করিমুল্লা হুজুরের মারপিটের অনেক সুনাম ছিল, অনেক দূর থেকে মারপিটের শব্দ আর ছাত্রদের আর্তনাদ শোনা যেত। তাই দূর দূর থেকে বাবা-চাচারা তাঁদের ছেলেদের এই মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিয়ে যেত।

যা-ই হোক, বাবা কিছু ভালো-মন্দ উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। আমার ইচ্ছা হলো ডাক ছেড়ে কাঁদি। কিন্তু কেঁদে লাভ কী, আমার কান্না শুনবে কে?

মাদ্রাসায় মতিন নামে একটি ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। সে আমার পিঠে হাত দিয়ে বলল, "ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে খামোকা কাঁদবি না। তোর কান্না কেউ শুনতে পাবে না। যদি আস্ত থাকতে চাস, তাহলে রেডি হ।"

আমি রেডি হতে শুরু করলাম, আর এইভাবে আমার মাদ্রাসার জীবন শুরু হলো। হুজুর করিমুল্লা ছাড়া মাদ্রাসার আরও দুইজন শিক্ষক আছেন, তাঁরা একে-অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ছাত্রদের পিটান। প্রথম প্রথম আমরা পিটুনি খেয়ে গলা ছেড়ে কাঁদতাম, ধীরে ধীর অভ্যাস হয়ে গেল। মাদ্রাসার অন্য ছাত্রদের সাথেও পরিচয় হলো। সারা দিন আমরা হাদিস শরিফ, ফিকাহ মুখস্থ করি, রাতের বেলা যখন কেউ থাকে না, তখন আমরা নানা রকম বাঁদরামো করি।

যাই হোক এইভাবে আমার কয়েক বছর কেটে গেল। লেখাপড়া খুব একটা শিখি নাই। সুর করে আরবি পড়তে পারি, দুই-চারটা সুরা মুখস্থ হয়েছে, কোন

কাজ করলে কী রকম গুনাহ্ হয় আর তার জন্য দোজখের আগুনে কত দিন ধরে পুড়তে হয়, সেগুলো মোটামুটি জেনেছি।

এ রকম সময়ে একদিন একটা ঘটনা ঘটল। ঘটনাটার কথা বলার আগে হুজুর করিমুল্লার আরেকটা কথা বলা দরকার। ছাত্রদের পিটিয়ে মানুষ করা ছাড়াও তাঁর আরও একটা বিষয়ে খুব সুনাম ছিল, সেটা হচ্ছে জিন-ভূতের চিকিৎসা। আজকালকার দিনে লোকজনের ওপর জিন-ভূতের সেই রকম আছর হয় না, আমাদের সময় সেটা ছিল একটা নিয়মিত ঘটনা। এমন কোনো বাড়ি ছিল না যে বাড়িতে দুই-চারজন বউ-ঝিকে জিনে ধরত না। হুজুর করিমুল্লা সেসব জিন-ভূতে পাওয়া রোগীর চিকিৎসা করতেন।

চিকিৎসাটা ছিল মোটামুটি সহজ। বিড়বিড় করে কিছু দোয়া-দরুদ পড়া আর তারপর রোগীটাকে অত্যাচার করা। কঠিন কঠিন অত্যাচার– যে রকম মাঘ মাসের শীতে পুকুরের পানিতে একশ' একবার ডুব দেওয়া, চোখের মাঝে কাঁচামরিচ বেটে ডলে দেওয়া, শুকনা মরিচ পুড়ে নাকের মধ্যে ধোঁয়া দেওয়া; আর মাদার গাছে বেঁধে বরইগাছের ডাল দিয়ে পেটানো– এগুলো তো আছেই। সেই ভয়ংকর অত্যাচারে জিন-ভূতের বাবার সাধ্য আছে থাকে? তারা বাপ বাপ করে পালাতো! জিন-ভূতে পাওয়া রোগীকে দূর-দূরান্ত থেকে মাঝে মধ্যেই মাদ্রাসায় নিয়ে আসা হতো– আমরা সুরা মুখস্থ করতে করতে দেখতাম রোগীকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে– আর সন্ধ্যার পর চিকিৎসার নামে শুরু হতো অত্যাচার। সব মিলিয়ে একেবারে ভয়াবহ ব্যাপার!

যাই হোক, এক কোরবানির ঈদের ঘটনা। ঈদের আগে মাদ্রাসায় ছুটি হয়েছে। মাদ্রাসার সবাই চলে গেছে, রয়ে গেছি খালি আমি আর মতিন। মতিনের বাড়িতে কেউ নেই, রোজা-রমজান বা ঈদের ছুটিছাঁটাতেও সে মাদ্রাসায় থাকে। আমার বাড়ি অনেক দূর– গয়না নৌকার সঙ্গে যোগাযোগ করে যেতে হবে, সে জন্যে দেরি হচ্ছে। হুজুর করিমুল্লার বাসা মাদ্রাসার সঙ্গে লাগানো, সেইখানে হুজুর তাঁর দুই বিবি নিয়ে থাকেন। সেই বিবিরা খুব পর্দানশীন, আমরা কখনো দেখি নাই, শুনেছি দুইজনেই নাকি ডানাকাটা পরী। পরপুরুষদের মহিলাদের গলার আওয়াজ শোনা ঠিক না, কিন্তু আমরা শুনতাম দুই বিবি ক্যাটক্যাট করে রাতদিন ঝগড়া করছে। মাঝে মাঝে হুজুর খেপে গিয়ে তাঁর দুই বিবিকে শাসন করতেন, সেটা ছিল আরও ভয়াবহ ব্যাপার।

একদিন হুজুর করিমুল্লা তাঁর এক বিবিকে বাপের বাড়িতে রেখে আরেক

বিবিকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে গেছেন। আমার আর মতিনের ওপর পুরো মাদ্রাসার দায়িত্ব। হুজুর ফিরে এলে আমরা বাড়ি যাব। পুরো মাদ্রাসা খালি, গাছপালায় ঢাকা পুরোনো দালান, দিনের বেলাতেই অন্ধকার হয়ে থাকে। যখন অন্য ছাত্ররা ছিল, ভয়ডর করে নাই; কিন্তু একা কেমন জানি গা ছমছম করে। মতিন ছিল বদমাইশের ঝাড়, এমনিতে ভয় ভয় করে, তার মাঝে সে দিনরাত খালি জিন-ভূতের গল্প করে ভয় দেখাত।

আমি যে দিনের কথা বলছি সে সেদিন দুপুরবেলা দূরের কোনো একটা গ্রাম থেকে দুইজন মানুষ জিনে পাওয়া একটা রোগী নিয়ে এসেছে হুজুরের কাছে। যখন শুনল হুজুর নেই, তখন তারা একটু বিপদে পড়ে গেল– রোগী নিয়ে থাকবে না চলে যাবে বুঝতে পারছিল না।

আমরা জিন-ভূতের রোগী দেখে অভ্যস্ত। এই রোগীগুলোর মধ্যে একটা মিল থাকে। সবাই কেমন যেন ভয়ের মাঝে থাকে, হাত-পা কাঁপে, ভালো করে হাঁটতে পারে না, বিড়বিড় করে কথা বলে, হাউমাউ করে কাঁদে। কিন্তু এই রোগীটা একেবারে অন্য রকম। দেখে মনে হয় পুরো স্বাভাবিক। রোগীর বয়স বেশি না, তেইশ-চব্বিশ বছর হবে। গায়ের রঙ ফর্সা, মাথার চুলগুলো একটু লম্বা, দেখে মনে হয় যাত্রাদলে অভিনয় করে। পাজামা আর শার্ট পরে আছে, শরীরে একটা চাদর জড়ানো। মানুষটা বেশি কথা বলে না, কী রকম জানি মেরুদণ্ড সোজা করে শক্ত হয়ে বসে থেকে শুধু এদিক-সেদিক তাকায়। চোখের দৃষ্টিটা একটু অন্য রকম, চোখে চোখ পড়লে কেমন জানি বুক কেঁপে ওঠে।

মতিন সাথের মানুষ দুইজনকে জিজ্ঞেস করল, "এই আপনাদের রোগী?"

মানুষ দুইজন মাথা নাড়ল। আমি বললাম, "দেখে তো কোনো সমস্যা আছে মনে হয় না।"

আমার কথা শুনে রোগী দাঁত বের করে হাসল, দাঁতগুলো লালচে দেখে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। মতিন বলল, "রোগীর কোনো সমস্যা নেই। নিয়ে যান।"

আমি বললাম, "হুজুর আসবে পরশু দিন, তখন আসবেন।"

সঙ্গের দুইজন মানুষ নিজেদের মধ্যে বিড়বিড় করে কী যেন কথা বলে, আমাদেরকে কিছু বলে না। একটু পর দেখি রোগীকে রেখে মানুষ দুইজন পালিয়ে গেছে। আমি আর মতিন তখন রোগীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম। মতিন মানুষটাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার সঙ্গে দুইজন কই?"

মানুষটা তার লাল দাঁত বের করে হাসার মতো ভঙ্গি করে বলল, "চলে গেছে।"

"কোথায় চলে গেছে।"

"মনে হয় বাড়ি চলে গেছে।"

"আপনাকে রেখে বাড়ি চলে গেছে?"

মানুষটা মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ।"

"কেন?"

"ভয় পায় তো সেই জন্য।"

"আপনাকে ভয় পায়?"

"হ্যাঁ।"

"কেন? আপনাকে দেখে তো ভয় পাওয়ার কিছু আছে বলে মনে হয় না?"

মানুষটা কোনো কথা না বলে এদিক-সেদিক তাকাল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আছে?"

"এখন নাই। তবে–"

"তবে কী?"

"রাতে যখন ও আসবে–"

"কে আসবে?"

"ও।"

"ও-টা কে?"

"মানুষটা কথার উত্তর না দিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। মতিন তখন একটু রেগে উঠে বলল, "আপনি এখন যান। আপনার সঙ্গে যারা আসছে তাদের সঙ্গে বাড়ি যান।"

মানুষটা এমন একটা ভাব করল যেন মতিনের কথা শুনতেই পায় নাই। মতিন গলা উঁচিয়ে ধমক দিয়ে বলল, "যান। বাড়ি যান।"

মানুষটা মাথা নাড়ল বলল, "নাহ। যাব না।"

"যাবেন না?"

"না।"

"কেন যাবেন না?"

"জায়গাটা ভালো, আমার পছন্দ হয়েছে।"

"পছন্দ হয়েছে?"

"হ্যাঁ। অন্ধকার, লোকজন বেশি নেই। নিরিবিলি। ও যখন আসে, লোকজন থাকলে রাগ হয়।"

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "ও-টা কে?"

মানুষটা আমার কথার উত্তর দিল না। চাদর মুড়ি দিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

মতিন জিজ্ঞেস করল, "ও কেন আসে?"

"খিদে পায় তো, তাই খেতে আসে।"

"কী খায়?"

"রক্ত খায়।"

শুনে আমরা দুইজনই চমকে উঠলাম, "রক্ত খায়?"

মানুষটা তার দাঁত বের করে হাসল, দাঁতগুলো লাল। এবারে আমার গা ঘিনঘিন করতে লাগল। জিজ্ঞেস করলাম, "কিসের রক্ত?"

"যখন যেটা পায়। গরু-ছাগল।" একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "মানুষ।"

আমি চমকে উঠে বললাম, "মানুষ?"

মানুষটা কোনো কথা না বলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, তার চোখের দৃষ্টি দেখে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

আমি আর মতিন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে বসলাম। মতিন বলল, "এই লোকরে এইখানে রাখা যাবে না।"

আমি বললাম, "না। দিনের বেলাতেই দেখে এত ভয় লাগে, রাতে কী হবে?"

মতিন বলল, "আজ আবার অমাবস্যা।"

আমি বললাম, "চল, মানুষটাকে বের করে দেই।"

মতিন জিজ্ঞেস করল, "কোথায় বের করে দিবি?"

"ধরে নিয়ে বাজারে ছেড়ে দিব।"

আমার পরামর্শটা মতিনের পছন্দ হলো। বলল, "ঠিক আছে।"

আমি আর মতিন তখন গেলাম মানুষটাকে ধরে বের করে দিতে, গিয়ে দেখি মানুষটা নাই। চারিদিকে গাছগাছালি, ঝোপঝাড়-এর মাঝে মাদ্রাসার ভাঙা দালানের মধ্যে কেউ যদি লুকিয়ে থাকে, তাকে খুঁজে বের করা অসম্ভব ব্যাপার। তবুও আমি আর মতিন একটু চেষ্টা করলাম, কোনো লাভ হলো না।

রাত্রি বেলা আমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছি। হ্যারিকেনটা কমিয়ে মাথার কাছে রেখেছি, ঘরের ভেতরে আবছা অন্ধকার। বাইরে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে, গাছের পাতার শরশর একরকম শব্দ হচ্ছে। কাছাকাছি কোথা থেকে জানি

শেয়াল ডাকল, শেয়ালের ডাক খুব ভয়ের– মনে হয় একটা খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। শেয়ালের ডাকটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা শুনলাম, উঁ উঁ করে কে যেন কান্নার মতো শব্দ করছে। প্রথমে আস্তে আস্তে, তার পরে একটু জোরে। একটু পরে আরও জোরে। আমি আর মতিন দুইজনেই তখন বিছানায় উঠে বসলাম। মতিন জিজ্ঞেস করল, "কে? কে কাঁদে?"

আমি বললাম, "ওই মানুষটা হবে নিশ্চয়ই।"

"কোথায় আছে দেখবি?"

আমি বললাম, "যদি কিছু করে?"

"কী করবে? আমরা দুইজন আছি না?"

সেটা অবশ্য সত্যি কথা, আমরা দুইজন, পনেরো-ষোল বছর বয়স। গ্রামের ছেলে, হাট্টাকাট্টা জওয়ান– আমাদের কী করবে? খুঁজে খুঁজে ঘরের ভেতর থেকে দুইটা লাঠি বের করে হারিকেনটা হাতে নিয়ে বের হলাম। ঘর থেকে বের হতেই শব্দটা থেমে গেল। একটু পরে আবার শুরু হলো। প্রথমে আস্তে, তার পরে একটু জোরে। শব্দটা শুনতে শুনতে আমরা এগিয়ে যাই, দালানটার শেষ মাথায় একটা ছোট ঘর, পুরোনো বই-খাতা জঞ্জাল দিয়ে ভরা, মনে হচ্ছে শব্দটা সেখান থেকে আসছে।

আমরা ঘরটার দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে ভেতরে ঢুকে একেবারে হকচকিয়ে গেলাম। ঘরের জঞ্জাল পরিষ্কার করে সেখানে সাদা চাদরটা বিছিয়ে মানুষটা উদোম হয়ে শুয়ে আছে– দুই হাত, দুই পা লম্বা করে ছড়িয়ে রেখেছে। তার মুখ ঘামে ভেজা আর সেখান থেকে কান্নার মতো শব্দ বের হচ্ছে।

মতিন জিজ্ঞেস করল, "কী হচ্ছে? কী হচ্ছে এখানে?"

মানুষটা ভাঙা গলায় বলল, "ভয় করে। আমার খুব ভয় করে।"

"কী ভয় করে?"

"ওরে ভয় করে।"

"কেন ভয় করে?"

"আমারে খুব কষ্ট দেয়।"

"তাহলে ওকে আসতে দেও কেন?"

মানুষটা কোনো উত্তর দিল না। মতিন আবার জিজ্ঞেস করল, "কেন আসতে দাও?"

"না দিয়ে উপায় নাই। লোভে পড়ে বিক্রি করে দিছি।"

"কী বিক্রি করেছ?"

"শরীরটা। এই শরীরটা। এখন দরকার হলে ও ব্যবহার করে।"

"কী করে ব্যবহার করে?"

"জানি না। একেক সময় একেকটা করে। খায়, অত্যাচার করে। আমি তো জানি না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "খালি গায়ে শুয়ে আছ কেন?"

"গরম। অনেক গরম।

পৌষ মাসের কনকনে শীত, আমরা চাদর মুড়ি দিয়ে শীতে ঠকঠক করে কাঁপছি, তার মাঝে এই মানুষটার গরম লাগছে, ঘামে শরীর ভিজে জবজবে হয়ে আছে।

আমি আর মতিন একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম, ঠিক কী করব বুঝতে পারছিলাম না।

মতিন বলল, "আয়, আমরা যাই।"

মানুষটা বলল, "দাঁড়াও।"

"কী হয়েছে?"

"তোমরা একটা কাজ করো।"

"কী কাজ?"

"আমাকে বেঁধে রেখে যাও।"

"বেঁধে রেখে যাব?"

"হ্যাঁ।" মানুষটা বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল, "আমাকে শক্ত করে বেঁধে রেখে যাও। আল্লাহর কসম লাগে।"

"কেন?"

"তা না হলে তোমাদের বিপদ হবে– অনেক বড় বিপদ। সময় নাই– তাড়াতাড়ি। ও আসছে।"

এই মানুষটার কথা ঠিক বিশ্বাস করব কি-না বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু কোনো কারণ নেই, কিছু নেই, একটা মানুষকে বেঁধে রাখে কেমন করে? আমরা কী করব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, তখন খুব অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল। হঠাৎ করে চারদিক কেমন যেন নীরব হয়ে গেল– প্রথমে আমরা বুঝতে পারলাম না কেন, একটু পর টের পেলাম। মাদ্রাসার চারপাশে গাছগাছালি সেখানে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা ঝিঁঝি পোকা ডাকে। হঠাৎ করে সেই ঝিঁঝি পোকাগুলো থেমে গেছে, গাছের পাতায় শরশর শব্দও শোনা যাচ্ছে না। এতক্ষণ মানুষটা ছটফট করছিল, এখন সে-ও একেবারে থেমে গেছে, নড়াচড়া করছে না, শক্ত হয়ে শুয়ে আছে।

আমি আর মতিন নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছি– হঠাৎ মনে হলো বাইরে

দিয়ে কে যেন এক মাথা থেকে অন্য মাথায় দৌড়ে গেল। গাছের ওপর কিছু পাখি ছিল, সাথে সাথে সেই পাখিগুলো কিচিরমিচির করে উড়ে গেল। একটু পরে আমরা আবার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম, মনে হলো দুদ্দাড় করে কেউ এবারে অন্য মাথা থেকে ছুটে আসছে। আমরা যে ঘরে দাঁড়িয়েছিলাম হঠাৎ সেই ঘরের দরজা দড়াম করে খুলে গেল, সাথে সাথে মনে হলো ঘরের ভেতর আগুনের হলকার মতোন একটা গরম বাতাস ঢুকেছে।

তখন আমি আমার জীবনের সবচেয়ে অবাক ব্যাপারটা ঘটতে দেখলাম, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা মানুষটার পুরো শরীর হঠাৎ করে ছিটকে ওপরে উঠে গেল। মনে হলো তার সারা শরীরের ভেতরে যেন কিছু কিলবিল করছে। মানুষটার শরীরটা কয়েক সেকেন্ড ওপরে ঝুলে থেকে হঠাৎ আছাড় খেয়ে নিচে এসে পড়ল। মানুষটা প্রথমে একটা চাপা আর্তনাদ করে তারপর যন্ত্রণায় গোঙাতে থাকে। আমরা বিস্ফারিত চোখে দেখলাম তার চেহারাটা আস্তে আস্তে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে তার চোয়ালের হাড়গুলো উঁচু হয়ে উঠল, চোখ দুটো টকটকে লাল হয়ে উঠল, মনে হলো কোটর থেকে বের হয়ে আসবে। জিবটা লম্বা হয়ে মুখ থেকে বের হয়ে আসে, মাড়িটা উঁচু হয়ে দাঁতগুলো মুখের বাইরে চলে আসে। মানুষটা সারা শরীর কেমন যেন দুমড়াতে-মোচড়াতে থাকে। দেখে আমি আর মতিন ভয়ে-আতঙ্কে একেবারে পাথরের মতো জমে গেছি, নড়তে পারছি না। আমার হাতের হারিকেনটা বার কয়েক দপদপ করে জ্বলে উঠে নিভে গেল। ঠিক নিভে যাওয়ার আগে আমার মনে হলো মানুষটা কুকুরের মতো উঠে বসেছে, তারপর আমাদের দিকে লাফ দিয়েছে।

আমি ভয়ে-আতংকে চিৎকার করে ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে ছুটতে শুরু করলাম পাগলের মতো ছুটছি আর ছুটছি। মনে হচ্ছে আমার পেছনে পেছনে ভয়ংকর একটা দানব ছুটে আসছে, এই বুঝি আমাকে ধরে ফেলবে! ছুটতে ছুটতে আমি নিশ্চয়ই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম, তার পরে আমার আর কিছু মনে নাই।

গহর মামা এই রকম সময়ে তাঁর কথা শেষ করে কান চুলকাতে লাগলেন। আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে বসেছিলাম। এবার জিজ্ঞেস করলাম, "তার পরে কী হলো মামা? কী হলো?"

"সকালবেলা লোকজন আমাকে পেয়েছে। জ্ঞান নাই, মুখ দিয়ে গ্যাজলা বের হচ্ছে।"

"গ্যাজলা কী মামা?"

"গ্যাজলা চিনিস না? লালার মতোন। অনেক ভয় পেলে মুখ দিয়ে গ্যাজলা বের হয়।"

"তারপর কী হলো? তোমার গল্প শেষ করো মামা।"

"গল্প তো শেষ। অনেক দিন জ্বরে ভুগে আমি সুস্থ হয়েছি। তবে আমার একটা লাভ হয়েছিল।"

"কী লাভ হয়েছিল মামা?"

"আমার আর মাদ্রাসায় যেতে হয় নাই।"

"আর মতিন? মতিনের কী হলো?"

গহর মামা কোনো কথা না বলে খুব মনোযোগ দিয়ে কানে একটা আঙুল ঢুকিয়ে চুলকাতে লাগলেন। তাকে দেখে মনে হতে লাগল, কেনে আঙুল দিয়ে কান চুলকানোর মতো জরুরি কাজ আর কিছু নেই।

আমরা আবার জিজ্ঞেস করলাম, "মতিনের কী হলো মামা?"

"যা-যা, ঘুমাতে যা।"

"কিন্তু মতিনের কী হলো?"

"যা হবার হয়েছে, তোরা শুনে কী করবি?"

"কী আশ্চর্য!" আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, "একটা গল্প শুরু করেছ, সেটা শেষ করবে না? সব গল্পের একটা শুরু থাকে, একটা শেষ থাকে, তুমি জানো না?"

"থাকলে থাকে। আমার গল্প যেটুকু বলেছি, সেটুকুই। কোনো শুরু নাই শেষ নাই।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে মামা, তুমি যদি বাকিটা বলতে না চাও তাহলে আমি বাকিটা বলি?"

গহর মামা আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বললেন, "বল।"

"পরদিন সকালে মতিনের ডেডবডি পাওয়া গেছে। শরীরটা সাদা আর ফ্যাকাসে। তার শরীরে কোনো রক্ত নাই-"

গহর মামা চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকালেন। কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

আমি বললাম, "আর সেই মানুষটা-"

"মানুষটা কী?"

"মানুষটা ভালোই আছে। মোটা-তাজা হয়েছে।"

গহর মামা মুখ শক্ত করে বললেন, "কেন? মোটা-তাজা কেন হয়েছে?"

"রক্ত খুব ভালো প্রোটিন মামা, তুমি জানো না?"

আলমারি

সুটকেস খুলে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম, ভেতরে আমার বই-কাগজপত্র ইঁদুরে কেটে কুটি কুটি করে রেখেছে। আমি বই-কাগজপত্রগুলো বের করতে গিয়ে খুব মৃদু কুঁই কুঁই একটা শব্দ শুনতে পেলাম, তাকিয়ে দেখি এক কোনায় তিনটা ছোট ছোট ইঁদুরের বাচ্চা, এত ছোট যে এখনও চোখ ফুটে নি। বাসায় অনেকদিন থেকে ইঁদুরের উৎপাত, কারণটা বোঝা গেল, তারা আমার সুটকেসের মাঝে রীতিমতো সংসার শুরু করেছে। একবারে তিনটা করে বাচ্চা হলে কয়দিনের ভিতরেই তো ইঁদুররাই বাসায় থাকত, আমাকে গিয়ে রাস্তায় থাকতে হবে।

ময়নার মা কাছেই ঝাঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে বলল, "ভাই সরেন, এই ইন্দুরের ব্যবস্থা করি।"

"কী করবে?"

"কী করমু মানে? ইন্দুরের বাচ্চা পালবেন নাকি? ঝাঁটার বাড়ি দিয়া শেষ করমু।"

"না-না, মারার দরকার নেই, তুমি বরং বাইরে ফেলে আসো।" এই ছোট ছোট ইঁদুরের বাচ্চাকে ঝাঁটা দিয়ে পিটিয়ে মারবে বিষয়টা আমি ঠিক মেনে নিতে পারলাম না। সুটকেসের কোনায় লোমহীন শরীরে আঁকুপাঁকু করে একটা আরেকটার সাথে জড়াজড়ি করছে দেখে এক ধরনের মায়া হয়।

ময়নার মা আমার কথা শুনে একই সাথে অবাক আর বিরক্ত হলো। বলল, "ইন্দুরের বাচ্চার জন্যে মায়া করেন ভাই?"

"না, ঠিক মায়া না– তবে মারার দরকার কী? একটা ঠোঙায় ভরে দূরে কোথাও ফেলে আসো।"

"এইগুলা যখন বড় হইব তখন আপনার মোটা মোটা বইগুলান কচকচ কইরা খাইব!"

আমি বললাম, "আসলে আমারই ভুল হয়েছে। এই বই-কাগজপত্র এই রকম

স্যুটকেসে রাখা ঠিক হয় নাই। একটা শক্ত স্টিলের আলমারিতে রাখা দরকার ছিল।"

ময়নার মা বলল, "সেইটা ঠিক।"

তাই সেইদিন দুপুরবেলা আমি স্টিলের আলমারি কিনতে গেলাম। নয়াবাজারে পাশাপাশি অনেকগুলো স্টিলের আলমারির দোকান। বাইরে ওয়েল্ডিং করছে, পালিশ করছে, রঙ করছে– ভিতরে তৈরি হয়ে যাওয়া আলমারিগুলো সাজানো। আমি প্রথম দোকানে ঢুকতেই দোকানের মালিক এগিয়ে এলো, মধ্যবয়স্ক মানুষ, গায়ের রঙ কালো, আধপাকা চুল, কপালে একটা কাটা দাগ, সাদা দাঁত বের করে হেসে বলল, "স্যার, আসেন স্যার, ভিতরে আসেন। কি নিবেন।"

"একটা স্টিলের আলমারি।"

"এই যে স্যার দেখেন, কোনটা পছন্দ। বাইরে আয়না ফিটিং আছে, একেবারে বেলজিয়াম গ্লাস।"

আমি বললাম, "না, না আমার আয়না-টায়না লাগবে না। সিম্পল একটা আলমারি দরকার–"

মালিক আমাকে এক কোনায় নিয়ে গেল, "এই যে দেখেন একেবারে সিম্পল। সলিড জিনিস, ফিনিশিংটা দেখেন একবার।"

আমি আলমারিটা দেখলাম, ভেতরে চারটা তাক, বইপত্র রাখতে সমস্যা হবার কথা না। দরজাটা কয়েকবার বন্ধ করে আর খুলে দেখলাম, মোটামুটি সহজেই বন্ধ হচ্ছে আর খুলছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কত দাম?"

কুচকুচে কালো দোকানি তার ঝকমকে সাদা দাঁত বের করে হেসে বলল, "স্যার দাম নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। আলমারিটা আপনার পছন্দ হয়েছে কী-না বলেন।"

আমি হাসার ভঙ্গি করে বললাম, "দামটা কম হলেই পছন্দ হবে!"

আমি খুব একটা হাসির কথা বলেছি এরকম ভঙ্গি করে কুচকুচে কালো মানুষটা তার সাদা দাঁত বের করে হা হা করে হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, "স্যার, আমরা ব্যবসায়ী মানুষ! ইচ্ছা করলেই আমরা সস্তা জিনিস বানাতে পারি। খারাপ দুই নম্বুরী মাল দিয়ে তৈরি একটা জিনিস আপনাকে কখনোই দিব না স্যার! আপনি আরও কয়টা দোকান দেখে আসেন–"

আমি আরও কয়েকটা দোকান ঘুরে আবার প্রথম দোকানে ফিরে এলাম– একজন মাঝবয়সি মহিলা দোকানের মালিকের সাথে কী নিয়ে জানি তর্ক করছিল,

আমাকে দেখে চুপ করে গেল। কালো মানুষটি মহিলাটিকে হাত দিয়ে সরিয়ে দেবার ভান করে বলল, "যাও, যাও এখন এখান থেকে। তোমার ছেলে নিজেই ফিরে আসবে!"

মহিলাটি কিছু একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। আমি একটু ইতস্তত করে দোকানের মালিককে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

"আর বলবেন না!" মানুষটি হাত দিয়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার ভান করে বলল, "ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। এখন এইখানে এসে চোটপাট–"

মহিলাটি বলল, "আপনার এইখানেই তো কাজ করত–"

"হ্যাঁ। যখন কাজ করত তখন কাজ করত, কাজ শেষ করে হিল্লি-দিল্লি কই যায় কী করে আমি কী তার খোঁজ রাখি?"

"কোথাও যায় নাই–"

কালো মানুষটি এবার রেগে উঠে বলল, "কোথাও যায় নাই তো সে বাড়ি আসে না কেন? তুমি এখন যাও, কাস্টমারদের ডিস্টার্ব দিও না।"

মহিলাটি কাস্টমারদের "ডিস্টার্ব" না দেবার জন্যে সরে গেল। ঠিক কী কারণে জানি না আমার মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়। সন্তান হারিয়ে যাবার মতো ভয়ংকর ব্যাপার আর কী হতে পারে? এই মা'টি এখন কী নিয়ে বেঁচে থাকবে? আহা বেচারি, ছেলেটি কোথায় আছে কেমন আছে কে জানে!

কালো মানুষটি মনে হয় আমার মুখ দেখে বিষয়টা একটু অনুমান করতে পেরেছে, আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বলল, "স্যার এই সব ছেলেপিলে অসম্ভব দুষ্টু! কোথায় গেছে, কয়দিন ঘোরাঘুরি করে চলে আসবে।"

আমি বললাম, "চলে আসলেই ভালো।"

"আপনি বসেন স্যার। এক কাপ চা আনি। নাকি ঠাণ্ডা কিছু খাবেন?"

আমি চা কিংবা ঠাণ্ডা কিছুর যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে তাড়াতাড়ি টাকা-পয়সা দিয়ে কেনাকাটা সেরে ফেলি। আজ বিকেলেই আমার বাসায় আলমারিটা পৌঁছে দেবে। ক্যাশমেমোর সাথে দোকানি তার একটা ভিজিটিং কার্ড লাগিয়ে দিয়েছে, তার নাম আজিজ মিয়া, ঠিক কী কারণ জানা নেই, কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করত এই লোকটার নাম কী হওয়া উচিত আমি সম্ভবত আজিজ মিয়াই বলতাম।

ময়নার মা স্টিলের আলমারিটা দেখে খুব বিরক্ত হলো। আমার স্ত্রী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে মাসখানেকের জন্যে বাড়ি গিয়েছে। আমাকে দেখাশোনার দায়িত্ব

দিয়ে গেছে ময়নার মা'কে। ময়নার মা সকালে এসে ঘরদোর পরিষ্কার করে আমার জন্যে কিছু একটা রান্না করে দিয়ে যায়, এই সময়টাতে সে যতটুকুই পারে আমাকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়ে মানুষ করার চেষ্টা করে। আমি আমার স্ত্রীর সাথে কোনো পরামর্শ না করে এত বড় একটা আলমারি কিনে এনেছি এই বিষয়টাও সে সহজভাবে নিতে পারলে না। কত দিয়ে কিনেছি সেটাও জানতে চাইল, ইচ্ছে করে কমিয়ে অর্ধেক দাম বলেছি, সেটা শুনেই তার চোখ কপালে উঠেছে। আমার স্ত্রী বাড়ি ফিরে এলে সে কীভাবে তাকে নালিশ করবে, নানাভাবে সেটা নিয়ে সে গজরগজর করতে থাকে।

পড়ার ঘরে আলমারিটার জায়গা হয়েছে, বইপত্র তখনই আলমারিতে তুলে রাখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু টেলিভিশনে একটা সিনেমা দেখতে শুরু করে আটকা পড়ে গেলাম, যখন সিনেমা শেষ হয়েছে তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। ময়নার মা রান্না করা খাবারগুলো টেবিলে সাজিয়ে রেখে গেছে, গরম করে নিতে আলসেমী লাগছিল, সেভাবেই খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মে মাসের ভ্যাপসা গরম, ফুল স্পিডে ফ্যান চালিয়েও ঘুম আসে না, বিছানায় ছটফট করতে হয়।

গভীর রাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল, আমার মনে হলো আমি কোনো এক ধরনের শব্দ শুনছি। দুমদুম করে শব্দ হচ্ছে, থেমে থেকে কিছুক্ষণ হয়ে আবার বন্ধ হয়ে যায়। আমি ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু চোখে এত সহজে ঘুম আসতে চাইলো না। বাসায় অসংখ্য হৃষ্টপুষ্ট ইঁদুর ঘুরে বেড়ায়, তারা সহজেই এরকম শব্দ করতে পারে বলে নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম তারপরও ভেতরটা খচখচ করতে লাগল। আমি শেষে বিছানা থেকে নেমে এলাম, এবার বোঝা যাচ্ছে শব্দটা আসছে পড়ার ঘর থেকে। অন্ধকারে হাতড়ে লাইটটা জ্বালাতেই শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল।

আমি তবুও হেঁটে হেঁটে পড়ার ঘরে এসে বাতি জ্বালালাম, পরিচিত পরিবেশে বিশাল স্টিলের আলমারিটাকে কেমন জানি বেখাপ্পা দেখাচ্ছে, এ ছাড়া চোখে পড়ার মতো কিছু নেই। আমি এদিক-সেদিক দেখে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ঠিক ঘুমিয়ে যাবার মুহূর্তে মনে হলো আবার সেই দুমদুম শব্দটা শুরু হয়েছে। কোথা থেকে শব্দ হচ্ছে একবার দেখা উচিত জেনেও আমি আর উঠতে চাইলাম না, শব্দটা শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে গেলাম।

ভোরবেলা নাশতা করতে করতে ময়নার মাকে বললাম, "ময়নার মা, এই বাসায় ইঁদুরের খুব উৎপাত।"

ময়নার মা মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, "ইন্দুরের জন্যে এত মায়া করলে ইন্দুরের উৎপাত হবে না? একশ বার হবে। হাজার বার হবে।"

আমি তার বিরক্তিটা হজম করে বললাম, "আমার মনে হয় ইঁদুর মারার জন্যে কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে।"

ময়নার মা বলল, "সেইটা আপনার আর বলতে হবে না। আমি কাল রাত্রেই ইন্দুর মারার বিষ দিয়েছি। ছয়টা ইন্দুর মরেছে। এই মোটা মোটা একেকটা ইন্দুর!"

ময়নার মা হাত দিয়ে ইঁদুরের যে সাইজ দেখাল কোনোভাবেই ইঁদুর প্রজাতির এত বড় হবার কথা না, তবে আমি সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। আমার দুশ্চিন্তার কারণ অন্য জায়গায়, আমি বললাম, "ইঁদুর মারার বিষ কিন্তু খুব ভয়ানক। তুমি কীভাবে দিচ্ছ? কোথায় দিচ্ছ? হাত ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে নাও তো?"

ময়নার মা হি হি করে হেসে বলল, "ভাই, আমারে কী ছোড় পোলাপান পাইছেন? আমি জানি।"

"তবু শুনি, কীভাবে দিচ্ছ?"

"গমের দানার মতো, ঘরের কোনায় কোনায় ছিটিয়ে দিতে হয়। ইন্দুর খায় আর রক্তবমি করে মরে।"

"একটা খবরের কাগজের উপর বিছিয়ে দিও, সকালবেলা ঝাড়ু দিয়ে ফেলে দেবে।" আমি মুখ শক্ত করে বললাম, "খবরদার হাত দিয়ে ছুঁবে না। তার পরও সাবান দিয়ে খুব ভালো করে হাত ধুবে।"

ময়নার মা মুখে এক ধরনের তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আমার কথাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিল বলে মনে হলো না।

সেদিন রাতেও আমার হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল, ঠিক কেন ঘুম ভেঙেছে বুঝতে পারছি না, শুধু মনে হচ্ছে একটা ভয়ানক কিছু ঘটেছে। আমি ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসতেই স্পষ্ট শুনতে পেলাম পাশের ঘর থেকে দুমদুম করে শব্দ হচ্ছে।

আমি বিছানা থেকে নেমে এলাম, লাইটের সুইচে হাত রেখেও আমি শেষ পর্যন্ত লাইট জ্বালালাম না। আবছা অন্ধকারে শোয়ার ঘর থেকে হেঁটে হেঁটে পড়ার ঘরে যেতে থাকি, যতই কাছে যেতে থাকি ততই শব্দটা স্পষ্ট হতে থাকে। পড়ার ঘরে পৌঁছানোর পর বুঝতে বাকি থাকে না শব্দটা আসছে আলমারির ভেতর

থেকে, মনে হতে থাকে কোনো কিছু আলমারির ভেতর বসে আছে এবং সেটা আলমারির দরজায় ধাক্কা দিয়ে শব্দ করছে।

হঠাৎ করে আমি এক ধরনের আতংক অনুভব করি। আমার মনে হতে থাকে আলমারির ভেতর ভয়ংকর অশরীরী কিছু বসে আছে, এক্ষুনি দরজা খুলে সেটা বের হয়ে আসবে। আমি হাতড়ে হাতড়ে লাইট সুইচটা বের করে সুইচটা টিপে দিতেই পুরো ঘরটা উজ্জ্বল আলোতে ভরে গেল, ঠিক ম্যাজিকের মতো সাথে সাথে শব্দটা থেমে গেল। আমি একটানা শব্দটাতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ করে শব্দটা থেমে যেতেই কেমন যেন এক ধরনের অস্বস্তি হতে থাকে। ঘরের উজ্জ্বল আলোতে চোখটা সইয়ে নিয়ে আমি সাহস করে আলমারিটার কাছে গেলাম, হাত দিয়ে স্পর্শ করতেই আমার শরীরটা কেমন যেন কাঁটা দিয়ে উঠল, আলমারিটা একেবারে হিম শীতল। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সাবধানে আলমারিটার হ্যান্ডল ঘুরিয়ে দরজাটা খুললাম, মনে হচ্ছিল দেখব ভেতরে ভয়ংকর কিছু বসে আছে, দরজা খুলতেই লাফিয়ে বের হয়ে আসবে কিন্তু আসলে কিছুই নেই। শুধু মনে হলো ভেতর থেকে ঠাণ্ডা একটা বাতাস যেন আমাকে ঘিরে পাক খেয়ে মিলিয়ে গেল। আমি কিছুক্ষণ খালি আলমারিটার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে সেটার দরজা বন্ধ করে শোয়ার ঘরে ফিরে এলাম। আমি খুব ভীতু মানুষ নই, মাকড়সা কিংবা বিষাক্ত সাপ দেখলে আমার ভয় লাগে কিন্তু ভৌতিক কিছুতে আমি কখনো ভয় পাই না, তার পরেও আমি পড়ার ঘরের লাইটটা নেভাতে সাহস পেলাম না, লাইটটা জ্বালিয়ে রেখেই আমি শোয়ার ঘরে ফিরে এলাম।

বিছানায় শুয়েও আমি অনেকক্ষণ ছটফট করি। চোখে ঘুম আসতে চায় না। আমার শুধু মনে হতে থাকে আমার সাথে বুঝি আর কেউ আছে। অনেক চেষ্টার পর যখন চোখে প্রায় ঘুম নেমে এসেছে তখন হঠাৎ করে মনে হলো বিছানায় আমার পাশে কেউ বসে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আমি ভয়ানক চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠি, আসলে কিছুই নেই, ব্যাপারটা আমার চোখের ভুল। তারপরও আমার আর ভালো ঘুম হলো না, আধা জেগে আধা ঘুমিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

ভোরবেলা ময়নার মা আমাকে দেখে বলল, "ভাই, আপনার কী শরীল খারাপ?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "না তো। শরীর খারাপ কেন হবে?"

"আপনার চেহারা তো খারাপ দেখি।"

"রাত্রে ভালো ঘুম হয় নাই।"

"শরীরের ওপর অত্যাচার করেন তো ঘুম হবে কেমন করে?"

আমি শরীরের ওপর কী অত্যাচার করি সেটা একবার জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল, শেষ পর্যন্ত আর জিজ্ঞেস করলাম না। খাওয়া এবং ঘুম ছাড়া অন্য যে কোনো কাজকেই ময়নার মা শরীরের ওপর অত্যাচার বলে মনে করে।

দিনের বেলা আলমারিটাকে দেখে আমার নিজেকে কেমন জানি বোকা বোকা মনে হয়। রাত্রিবেলা একেবারেই অকারণে আমি এটাকে দেখে কতো ভয় পাচ্ছিলাম চিন্তা করে আমার হাসি পেতে থাকে। আজ রাতে এসে আলমারিতে আমার সব বইপত্র ঢুকিয়ে রাখব বলে মনস্থির করে ফেলি।

বাসায় ফিরে আসতে আসতে বেশ রাত হয়ে গেল। গুমট গরমে ঘেমে শরীর চটচট করছে, তাই খাওয়ার আগে আরো একবার গোসল করে নিলাম। যখন খাওয়া শেষ করেছি তখন হঠাৎ ঝড়ো বাতাসের শব্দ পেলাম। বাইরে থেকে বৃষ্টি ভেজা ঠাণ্ডা বাতাস এসে হঠাৎ করে ঘরের ভেতরটা শীতল করে দেয়। আকাশ চিরে কয়েক বার বিদ্যুৎ চমকালো, তারপর হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হলো। প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা করে, তারপর হঠাৎ ঝমঝম করে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি।

বৃষ্টি আমার খুব ভালো লাগে, আমি যে কোনো সময়ে, যে কোনো পরিবেশে বসে বসে বৃষ্টি দেখতে পারি। কাজেই আমি বারান্দায় বসে বসে বৃষ্টি দেখতে লাগলাম। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এবং সেই বিদ্যুতের আলোতে বহুদূর পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিদ্যুতের আলো এক ধরনের অতৃপ্তি রেখে যায়, তীব্র আলো বলে অনেক দূর দেখা যায় কিন্তু তার স্থায়িত্ব এত কম যে কোনো কিছুই ভালো করে দেখার আগে আলোটা মিলিয়ে যায়।

ঠিক এরকম সময় প্রচণ্ড বিদ্যুতের আলোতে চারিদিক ঝলসে ওঠে এবং সাথে সাথে প্রচণ্ড জোরে খুব কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়ল– সাথে সাথে ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায়। ইলেকট্রিসিটির আলোতে চারপাশে কেমন যেন বিবর্ণ একধরনের আলো ছিল, ইলেকট্রিসিটি চলে যাবার পর পুরো এলাকাটাতে এক ধরনের আলো-আঁধারী ভাব চলে এসেছে। আকাশে নিশ্চয়ই চাঁদ ছিল, মেঘে ঢেকে যাবার পরও একধরনের নরম আলোতে চারিদিক আলোকিত হয়ে আছে। আমি একধরনের মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম ঠিক তখন হঠাৎ আমি পড়ার ঘর থেক দুমদুম শব্দটা শুনতে পেলাম। ভয়ের একটা শীতল স্রোত আমার মেরুদণ্ড দিয়ে চলে গেল– ইলেকট্রিসিটি নেই আমি এখন চেষ্টা করলেও আলো জ্বালাতে পারব না।

পড়ার ঘরের আলমারির ভেতর থেকে দুমদুম শব্দটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, মনে হয় কেউ বুঝি আলমারির দরজা ভেঙে বের হয়ে আসবে। আমি ঠিক কী করছি চিন্তা না করেই পা পা করে পড়ার ঘরে হাজির হলাম। এক ধরনের আতংক নিয়ে আলমারিটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যাবার একটা অদম্য ইচ্ছাকে অনেক কষ্টে থামিয়ে রেখে আমি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। নিজের অজান্তেই আমার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে, আমি ঠিক করে নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না।

বিদ্যুতের আলোর ঝলকানিতে হঠাৎ করে ঘরের ভেতরটা স্পষ্ট হয়ে উঠল, আমি পরিষ্কার দেখলাম আলমারির হ্যান্ডেলটা আস্তে আস্তে ঘুরছে। ভেতর থেকে কিছু একটা বের হওয়ার চেষ্টা করছে।

আমি নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকি, আবছা আলোতে দেখতে পাই খুব ধীরে ধীরে হ্যান্ডেলটা ঘুরে যায়, খুট করে একটা শব্দ হয় তারপর দরজাটা খুলে যায়। আলমারির নিচে জমাট বাঁধা অন্ধকার সেখানে কিছু একটা গুড়ি মেরে বসে আছে। ঠিক তখন আমি কারো ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম।

হঠাৎ বিদ্যুতের আলো ঝলসে উঠল, আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম আলমারিতে গুটিশুটি মেরে বারো-তেরো বছরের একটা ছেলে বসে আছে, তার চোখে-মুখে এক ধরনের অবর্ণনীয় আতংক। সে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতর থেকে বের হবার চেষ্টা করে। নিজেকে টেনে টেনে বাইরে নিয়ে আসতে থাকে কিন্তু পারে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। কাছাকাছি আবার বিদ্যুৎ চমকে উঠল, আমি বিদ্যুতের আলোতে দেখতে পেলাম তার মাথার পেছনটা থেঁতলে গিয়েছে, রক্তে শরীরটা ভেসে যাচ্ছে। ছেলেটা থরথর করে কাঁপতে থাকে, মনে হচ্ছে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে।

ঠিক তখন ইলেকট্রিসিটি চলে এলো, তীব্র আলোতে ঘরটা ভেসে গেল, মনে হলো কেউ একজন যেন হাহাকারের মতো আর্তনাদ করে ওঠে। একটু আগেই যেখানে বারো-তেরো বছরের ছেলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল এখন সেখানে কিছু নেই। আলমারির দরজাটা হাট করে খোলা, ভেতরেও কিছু নেই।

আমার অনেকক্ষণ লাগল নিজেকে শান্ত করতে। অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে আমি আলমারির সামনে গেলাম। ভেতরে ভালো করে তাকালাম, খুব ভালো করে এটাকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে, তারপরও দেখা যাচ্ছে খাঁজের মাঝে শুকনো রক্ত। দশ-বারো বছরের একটা বাচ্চাকে এখানে কেউ একজন খুন করেছে। বাচ্চাটি আমাকে সেই কথাটা বলার চেষ্টা করছে।

আজিজ মিয়া আমার দিকে কেমন জানি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, "বলে ফেলেন। বাচ্চাটার ডেড বডি কী করেছেন?"

আজিজ মিয়া কী একটা বলতে চেষ্টা করল, বলতে পারল না। কয়েকবার তার ঠোঁট নড়ে ওঠে কিন্তু গলা থেকে কোনো শব্দ বের হয় না। আমি আজিজ মিয়ার দিকে আরেকটু ঝুঁকে পড়ি, "আলমারির ভেতরে শুকনো রক্ত আছে। কবজায় কাপড়ের সুতাও পেয়েছি। মনে হয় কয়েক গাছি চুলও আছে। আমি খালি চোখে যখন দেখেছি পুলিশ আরো অনেক ভালো করে দেখবে! তারা আরও অনেক কিছু পাবে। বলে ফেলেন কী হয়েছিল?"

আজিজ মিয়া মাথা নাড়ল, ফিসফিস করে বলল, "বিশ্বাস করেন স্যার, খোদার কসম! আমি মারতে চাই নাই। ওয়েল্ডিং মেশিনটা শর্ট করেছে, এমন মেজাজ খারাপ হলো, রাগের মাথায় রেঞ্চটা দিয়ে মেরেছি–"

আমি স্থির চোখে আজিজ মিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আজিজ মিয়া ভাঙা গলায় বলল, "আল্লাহ্‌র কসম আমি মারতে চাই নাই।"

আমি সোজা হয়ে বসে বললাম, "আমাকে বলেন কী করবেন? পুলিশের কাছে বলবেন। কোর্টে বলবেন।"

আজি মিয়া তখন ফ্যাঁসফ্যাঁস করে কাঁদতে শুরু করল।

আমি এখনও গভীর রাতে আলমারিটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। মনে হয় বুঝি আবার শুনব ভেতর থেকে দুমদুম শব্দ হচ্ছে, একটা দশ-বারো বছরের বাচ্চা ভেতর থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছে।

কিন্তু আর কখনো শুনি নি। আমাকে যেটা বলতে চেয়েছিল বাচ্চাটা সেটা বলে দিয়েছে, তার আর কিছু বলার নেই। কেমন আছে বাচ্চাটা? বেঁচে থাকতে পৃথিবীতে কোনো সুখ পায় নাই, এখন সুখ পেয়েছে তো?

মা-মণি

টুম্পা ঠোঁট ফুলিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, "আমি আম্মুর কাছে যাব।"

নার্গিস টুম্পার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাসটা বুকের মাঝে আটকে রাখে। চার-পাঁচ বছরের এই ফুটফুটে শিশুটি আর কখনোই তার আম্মুর কাছে যেতে পারবে না। তার আম্মু শায়লা গতকাল মারা গেছে। অফিসের গাড়িতে বাসায় আসছিল, একটা বেপরোয়া বাস গাড়িটাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে ফেলেছে। অন্য যারা ছিল তাদের হাত-পা-মাথা কেটেকুটে গেছে, সেই তুলনায় শায়লার সেরকম কিছু হয় নি। হাসপাতালে নেবার পর বার দুয়েক রক্ত বমি করল, তারপর শূন্য দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "টুম্পা! আমার টুম্পা!" টুম্পাকে খুঁজে না পেয়ে সে চোখ বন্ধ করল সেই চোখ আর খুলল না।

নার্গিস ফুটফুটে ছোট মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে কে বেশি দুর্ভাগা, শায়লা নাকী তার মেয়ে টুম্পা। টুম্পার জন্ম হবার পর শায়লার সাথে তার স্বামীর ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। মানুষটি এখন অস্ট্রেলিয়ায় আছে, আবার বিয়ে করেছে, ছেলেমেয়েও নাকী হয়েছে। নার্গিস অনেকবার শায়লাকে বিয়ে করে নতুন করে জীবন শুরু করতে বলেছিল, শায়লা রাজি হয় নি। বলেছে বিয়ের পর যদি মানুষটা টুম্পাকে দেখতে না পারে? আদর না করে? নার্গিস বলেছে, "এত মায়াকাড়া মেয়ে আদর না করে পারবে?" শায়লা তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, "ওর বাপই যদি পেরেছে অন্যেরা পারবে না কেন?" নার্গিস তখন ঠাট্টা করে বলেছে, "ঠিক আছে টুম্পাকে তাহলে আমাকে দিয়ে দিবি। আমার তো কেউ নেই, আমি মানুষ করব।" শায়লা তখন হি হি করে হেসে বলেছে, "ঠিক আছে, আমি যদি কখনো মারা যাই তাহলে তুই টুম্পাকে দেখেশুনে রাখিস!" নার্গিস তখন ঠাট্টা করে বলেছে, "থাক বাবা, তোকে মেরে আমি টুম্পাকে নিতে চাই না। আমার একটা বাচ্চার শখ আছে, তাই বলে এত শখ নেই!"

টুম্পার দিকে তাকিয়ে নার্গিসের মনে হলো শায়লা ঠাট্টা করে যেটা বলেছে ঠিক সেটাই হয়েছে। শায়লার আপনজন সেরকম কেউ নেই, জানাজার পর একটু

আহা-উঁহু করে যখন সবাই চলে গেল তখন নার্গিস অবাক হয়ে দেখল টুম্পা একেবারে একা। নার্গিস তাকে বুকে জড়িয়ে নিজের বাসায় নিয়ে এসেছে। ছোট মেয়ে চারপাশে কী হচ্ছিল ঠিক বুঝতে পারছিল না। যখন সবাই চলে গিয়েছে তখন নার্গিসের হাত ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, "আমি আম্মুর কাছে যাব!"

নার্গিস টুম্পাকে বুকে জড়িয়ে বলল, "ঠিক আছে, আমরা আম্মুর কাছে যাব।"

"কখন যাব?"

"এই তো সময় হলেই।"

"এখন কেন যাব না?"

নার্গিস বলে, "বোকা মেয়ে, আম্মু অফিসের কাজে গেছে, এখন কী আমরা যেতে পারি?"

কোথাও কিছু ভয়ানক গোলমাল আছে জানার পরও টুম্পা বিশ্বাস করে সত্যি তার আম্মু অফিসের কাজে গেছে। আম্মু অফিসের কাজে যাবার সময় মাঝে মাঝে টুম্পাকে নার্গিসের কাছে রেখে যেত– টুম্পা প্রাণপণে বিশ্বাস করার চেষ্টা করছে এটা বুঝি সেরকম একটা কিছু। তার শুধু মনে হচ্ছে এক্ষুনি কলিংবেল বেজে উঠবে, দরজা খুলতেই দেখবে তার আম্মু কাঁধে একটা ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে কলিং বেল বাজছে, মানুষজন আসছে কিন্তু তার আম্মু আর আসছে না।

গভীর রাতে টুম্পাকে ঘুম পাড়িয়ে নার্গিস যখন বিছানা থেকে নেমে আসছে তখন দেখে দরজার কাছে জাহিদ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। নার্গিস অনেক কষ্ট করেও চোখের পানি আটকাতে পারল না, ভাঙা গলায় বলল, "কী হয়ে গেল জাহিদ? এখন কী হবে?"

জাহিদ নার্গিসের পিঠে হাত দিয়ে বলল, "সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"কেমন করে সব ঠিক হবে?"

"তুমি এতদিন থেকে একটা বাচ্চা চাইছিলে, এই তো একটা বাচ্চা পেয়েছ। তুমি ওকে আদর করে বড় করতে পারবে না?"

"যদি আত্মীয়স্বজন এসে নিয়ে নেয়?"

"নেবে না। আমরা লেখালেখি করে নিয়ে নেব। শায়লার বাচ্চা তো আমাদেরই বাচ্চা।"

"টুম্পাকে তো আমি পেটে ধরি নি! তুমি ওকে আদর করবে তো?"

জাহিদ হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমাকে দেখে কী মনে হয় আদর করব না?"

নার্গিস মাথা নাড়ল, তারপর হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "শায়লা হতভাগী! কেমন করে এটা করতে পারলি? কেমন করে?"

জাহিদ নার্গিসের পিঠে হাত দিয়ে বলল, "আস্তে নার্গিস আস্তে। বাচ্চাটা উঠে পড়বে।"

সপ্তাহ খানেক টুম্পা খুব অস্থির হয়ে থাকল, বলতে গেলে যতক্ষণ জেগে আছে ততক্ষণ সে ঘরের আনাচেকানাচে আম্মুকে খুঁজেছে। দরজায় কলিং বেলের শব্দ হলেই সে দরজার কাছে ছুটে গেছে। টেলিফেন বাজতেই সে টেলিফোন ধরার চেষ্টা করেছে, দিনের শেষে ঘুমানোর আগে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে তাঁর আম্মুকে ডেকেছে। তারপর একদিন হঠাৎ করেই সে তার আম্মুকে খোঁজা বন্ধ করে দিল, ব্যাপারটা এত অস্বাভাবিক যে নার্গিস টুম্পাকে জিজ্ঞেস না করে পারল না, "টুম্পা! মা, তুই আজ সারাদিন একবারও তোর আম্মুকে খুঁজলি না?"

টুম্পা কোনো কথা না বলে মুখ টিপে হাসল। তাকে দেখে মনে হলো সে খুব একটা গোপন কথা জানে, যে কথাটা সে কাউকে বলবে না। টুম্পা জিজ্ঞেস করল, "কী হলো? তুই এরকম মুখ টিপে হাসছিস কেন?"

টুম্পা আবার একটু হাসল। বলল, "এমনি হাসছি।"

"কী হয়েছে মা, বল আমাকে।"

"তুমি কাউকে বলে দেবে না তো?"

"না, বলব না।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

টুম্পা গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, "আজকে আম্মু ফোন করেছিল।"

নার্গিস ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলেও টুম্পাকে বুঝতে দিল না। গলার স্বর খুব স্বাভাবিক রেখে বলল, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ খালামণি।"

"কখন ফোন করল?"

"দুপুরবেলা।"

"আমি তখন কোথায় ছিলাম?"

"তুমি ঘুমাচ্ছিলে।"

নার্গিস কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, "কী বলেছে তোর আম্মু?"

টুম্পা মুখ টিপে হেসে বলল, "বলব না।"

"কেন বলবি না?"

"আম্মু বলতে না করেছে।"

"আমাকে বললে কিছু হবে না, বল।"

"উঁহু বলব না।"

নার্গিস আর জোর করল না। একটু অবাক হয়ে টুম্পার দিকে তাকিয়ে রইল।

রাত্রিবেলা নার্গিস জাহিদকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল। জাহিদ শুনে বিষয়টাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিল না, বলল, "ছোট মানুষ, এত বড় একটা ধাক্কা খেয়েছে। তাই পুরো ব্যাপারটা কল্পনা করছে।"

নার্গিস শুকনো মুখে বলল, "কিন্তু এমনভাবে বলছিল যেন সত্যি সত্যি তার আম্মুর সাথে কথা বলেছে!"

"ছোট বাচ্চারা খুব ভালো কল্পনা করতে পারে। একেবারে জানপ্রাণ দিয়ে মায়ের সাথে দেখা করতে চায়, কথা বলতে চায়– তাই এরকম করছে।"

"কোনো সমস্যা হবে না তো?"

"ধুর! সমস্যা হবে কেন?"

কিন্তু নার্গিসের মনে হলো একটু সমস্যা শুরু হয়েছে। যখন আশেপাশে কেউ থাকে না তখন টুম্পা চুপি চুপি টেলিফোন কানে লাগিয়ে বসে থাকে। তার চোখ বড় বড় হয়ে যায়, জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে থাকে। তাকে দেখে মনে হয় সত্যি সত্যি বুঝি কেউ তার সাথে কথা বলছে। নার্গিস কয়েকদিন ব্যাপারটা লক্ষ করে। একদিন টুম্পার সাথে সরাসরি এটা নিয়ে কথা বলবে বলে ঠিক করল। দুপুর বেলা নার্গিস আর টুম্পা খেতে বসেছে, টুম্পা ইলিশ মাছ খেতে পছন্দ করে, তাকে কাঁটা বেছে দিতে দিতে বলল, "টুম্পা মা।"

"কী খালামণি?"

"তুই দেখি মাঝে মাঝেই টেলিফোনে কথা বলিস!"

টুম্পা একবার চোখ তুলে নার্গিসের দিকে তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে নিল, কিছু বলল না। নার্গিস জিজ্ঞেস করল, "তুই কার সাথে কথা বলিস?"

"বলব না।"

"বল।"

"উঁহু।"

"বল না। প্লিজ।"

"আম্মুর সাথে।"

নার্গিস একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "টুম্পা।"

"কী খালামণি?"

"তোর আম্মু যেখানে গেছে সেখান থেকে তো টেলিফোন করতে পারবে না।"

টুম্পার মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে, বলে, "পারবে।"

"আসলে– আসলে–" নার্গিস কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

টুম্পা জিজ্ঞেস করল, "আসলে কী?"

"তোকে তো কেউ টেলিফোন করে না। তুই কল্পনা করিস।"

খুব যেন মজা হয়েছে এরকম একটা ভঙ্গি করে টুম্পা হাসতে শুরু করল। নার্গিস অবাক হয়ে বলল, "কী হলো? তুই হাসছিস কেন?"

"আম্মু আমাকে বলেছে!"

"কী বলেছে?"

"আম্মু বলেছে তুই কাউকে বলিস না আমি কথা বলি।"

"কেন?"

"কেউ সেটা বিশ্বাস করবে না।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, খালামণি। তুমি কাউকে বলো না।"

"বলব না।" বলে নার্গিস একটা বড় নিশ্বাস ফেলল।

রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে নার্গিস চিন্তিত গলায় জাহিদকে বলল, "টুম্পার কী হয়েছে বলবে?"

"কেন?"

"তার আম্মুর সাথে কথা বলাটা দিন দিন দেখি বেড়েই যাচ্ছে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"আমার ব্যাপারটা ভালো লাগছে না।"

জাহিদ ইতস্তত করে বলল, "এত দুশ্চিন্তার কিছু নেই।"

"কী বলছ দুশ্চিন্তার নেই?"

"ঠিক আছে, আমার এক ডাক্তার বন্ধুর কাছে নিয়ে যাব।"

সত্যি সত্যি অবশ্যি ডাক্তারের কাছে নেয়া হয় না। ছোট একটা বাচ্চা টেলিফোনে তার মায়ের সাথে কথা বলছে, এই বিষয়টা কল্পনা করছে, সেটা নিয়ে সত্যি সত্যি দুশ্চিন্তার তেমন কিছু নেই, সেটা অনুমান করা কঠিন নয়।

দু'দিন পর দুপুরবেলা টুম্পাকে একটা গল্পের বই পড়ে শোনাতে শোনাতে নার্গিসের চোখ বুজে এলো। টুম্পাকে এক হাতে জড়িয়ে রেখে সে কয়েক মিনিটের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছে, হঠাৎ সে ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। তার পাশে টুম্পা নেই, বসার ঘর থেকে গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। নার্গিস ধড়মড় করে উঠে বসে পা টিপে টিপে বাইরের ঘরে গেল। টুম্পা টেলিফোনটা কানে লাগিয়ে কথা বলছে, "ঠিক আছে আম্মু... আচ্ছা। ঠিক আছে!"

নার্গিস সামনে গিয়ে বলল, "টুম্পা দাও দেখি টেলিফোনটা।"

টুম্পা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "না!"

"দাও বলছি।" বলে একরকম জোর করে টুম্পার হাত থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে সে নিজের কানে লাগাল। নার্গিস একেবারে নিঃসন্দেহ ছিল যে কানে দিয়ে শূন্য টেলিফোনের শোঁ শোঁ একটা শব্দ শুনবে। কিন্তু কী আশ্চর্য, টেলিফোনে বহুদূর থেকে যেন একটা অশরীরী নারী কণ্ঠ ভেসে আসে। নার্গিস চমকে উঠে বলল, "কে? কে কথা বলছে?"

অন্য পাশে টেলিফোনটা সাথে সাথে নীরব হয়ে গেল। নার্গিস রিসিভারটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে, বলল, "কে কথা বলছিল?"

"আম্মু।"

নার্গিস গলা উঁচিয়ে বলল, "কী বলেছে আম্মু?"

"কিছু না।"

"বল আমাকে কী বলেছে।"

টুম্পা ভয়ে ভয়ে বলল, "বলেছে আম্মু আমাকে দেখতে আসবে।"

"দেখতে আসবে? কখন?"

"আজ রাত্রে।"

"রাত্রে।"

"কোন রাত্রে?"

"আজ রাত্রে।"

"আজ রাত্রে?"

"হ্যাঁ খালামণি, আজকে আম্মু আমাকে দেখতে আসবে।" কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "আজকে আমাকে কিন্তু ঘুমাতে বলো না। আজকে আমার জেগে থাকতে হবে।"

নার্গিস বুক থেকে একটা নিশ্বাস বের করে দিয়ে বলল, "ঠিক আছে।"

সত্যি সত্যি সন্ধ্যাবেলা থেকে টুম্পা এক ধরনের উত্তেজনা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে কথা বলছে কম, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। নার্গিস ঠিক কী করবে বুঝতে পারছিল না। রাত্রিবেলা টুম্পা ভালো করে খেলো পর্যন্ত না, খুট করে কোথাও শব্দ হলেই সে চমকে চমকে উঠতে লাগল। এমনিতে রাত দশটার ভেতরে টুম্পা ঘুমিয়ে যায়, আজকে এগারোটা বেজে গেছে, এখনো সে শুতে যায় নি। নার্গিস টুম্পার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "টুম্পা।"

"কী খালামণি?"

"ঘুমাবি না?"

"উঁহু।"

"সারারাত জেগে থাকবি?"

টুম্পা কোনো কথা বলল না। নার্গিস বলল, "এখন শুয়ে পড়।"

"আম্মু আসবে আজ রাতে।"

"ঠিক আছে আম্মু এলে উঠে পড়িস।"

"উঁহু।"

"আমি তোকে ডেকে দিব।"

"উঁহু।"

"ঠিক আছে! তোর আম্মু এসে তোকে ডেকে তুলবে না?"

"তুলবে?"

"হ্যাঁ। তুলবে। তুই এখন শুয়ে পড়।"

"না খালামণি। আমি শুবো না।"

টুম্পা সত্যি সত্যি শুতে চাইল না, নার্গিস অবশ্যি একটু পরে এসে আবিষ্কার করল ক্লান্ত হয়ে একসময় বিছানায় হেলান দিয়ে মেঝেতে পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে গেছে। টুম্পাকে আদর করে কোলে নিয়ে সে বিছানায় শুইয়ে দিল। চাদর দিয়ে শরীরটা ঢেকে সে মশারিটা টানিয়ে দিল। ছোট মুখখানাতে কী আশ্চর্য এক ধরনের নিষ্পাপ সারল্য দেখে নার্গিসের বুকের ভেতরে হু হু করে ওঠে।

গভীর রাতে হঠাৎ নার্গিসের ঘুম ভেঙে গেল। একজন মানুষের চাপা গলার শব্দ ভেসে আসছে। কে কথা বলছে? পাশে শুয়ে থাকা জাহিদকে ঘুম থেকে তুলতে গিয়ে সে থেমে গেল। নার্গিস সাবধানে বিছানা থেকে নেমে আসে, গলার স্বরের শব্দটুকু আসছে টুম্পার ঘর থেকে, একটা নারী কণ্ঠ। নার্গিস পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়, ঘরের ভেতরে আবছা অন্ধকার। টুম্পা তার বিছানায় পা তুলে বসে

আছে, তার সামনে এক ধরনের জমাট বাঁধা অন্ধকার, মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি কেউ সেখানে বসে আছে। ঘরের ভেতর মিষ্টি এক ধরনের গন্ধ, আর কী আশ্চর্য, ঘরটা যেন একেবারে হিম শীতল। নার্গিস হঠাৎ করে বুকের ভেতর একধরনের কাঁপুনি অনুভব করে। সে কাঁপা গলায় ডাকল, "টুম্পা।"

টুম্পা কোনো কথা বলল না। নার্গিস আবার ডাকল, "টুম্পা। মা।"

"কী খালামণি?"

"তুই কী করছিস।"

"আম্মুর সাথে কথা বলছি।"

"কোথায় তোর আম্মু?"

"এই তো এইখানে।"

নার্গিস ঘরের আলো জ্বালিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কোথায়?"

তীব্র আলোতে টুম্পার চোখ ধাঁধিয়ে গেল, সে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে বলল, "তুমি কেন আলো জ্বাললে খালামণি?"

"কেন? কী হয় আলো জ্বাললে?"

"আলো জ্বাললে আম্মু থাকতে পারে না।"

"কেন?"

আম্মু অ-নে-ক দূর থেকে এসেছে তো, সেখানে কোনো আলো নেই। তুমি নেভাও আলোটা। নেভাও প্লিজ।"

"না।"

টুম্পা হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় বলল, "নেভাও!"

নার্গিস আলোটা নেভাল, টুম্পা আবছা অন্ধকারে এদিক-সেদিক তাকিয়ে ডাকল, "আম্মু! আম্মু!"

টুম্পার গলা শুনে নার্গিসের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে আস্তে আস্তে তার বিছানায় ঢুকে টুম্পাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "কী করছিস তুই মা টুম্পা।"

"আম্মুকে ডাকছি?"

"আছে তোর আম্মু?"

টুম্পা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "এখন নেই! তুমি লাইট জ্বালানোর সাথে সাথে আম্মু চলে গেছে।"

নার্গিস কোনো কথা বলল না। টুম্পা বলল, "আবার যখন আম্মু আসবে তুমি কিন্তু লাইট জ্বালিও না। ঠিক আছে?"

নার্গিস বলল, "ঠিক আছে। এখন তুই ঘুমা।"

টুম্পা বাধ্য মেয়ের মতো শুয়ে পড়ল।

পরদিন সন্ধেবেলা নার্গিস আর জাহিদ টুম্পাকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার মানুষটি আমুদে, টুম্পাকে নানাভাবে পরীক্ষা করে জাহিদ আর নার্গিসকে বললেন কোনো চিন্তা না করতে। বিষয়টা এক ধরনের কল্পনা। কল্পনায় কোনো দোষ নেই। আইনস্টাইন বলেছেন জ্ঞান থেকে কল্পনার গুরুত্ব অনেক বেশি। টুম্পা যত খুশি কল্পনা করুক।

ডাক্তার বলেছেন চিন্তা না করতে, তাই জাহিদ খুব বেশি চিন্তা করল না কিন্তু নার্গিসের ভেতরটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। ঠিক কী কারণ সে জানে না। তার শুধু মনে হয় এটা ঠিক কল্পনা নয়। এটা কল্পনা থেকে বেশি। এর মাঝে অন্য কিছু একটা আছে, যেটা তারা ধরতে পারছে না।

কয়দিন পর গভীর রাতে আবার নার্গিসের ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের ভেতর মনে হচ্ছে কনকনে শীত, তার সাথে একটা মিষ্টি গন্ধ। অচেনা বুনো ফুলের মতো গন্ধ, যার সাথে আগে কখনো পরিচয় হয় নি। নার্গিস বিছানায় গুটিশুটি মেরে শুয়ে কান পেতে রইল তার মনে হলো টুম্পার ঘর থেকে মৃদু গলার কথোপকথন ভেসে আসছে। নার্গিস তখন বিছানায় উঠে বসল, পাশে জাহিদ গভীর ঘুমে অচেতন, নার্গিস তাকে ডাকবে কী না বুঝতে পারল না। শেষ পর্যন্ত তাকে ডাকল না, নিজেই বিছানা থেকে নেমে এলো। নিঃশব্দে সে টুম্পার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। জোছনার আলো ঘরের মেঝেতে এসে পড়েছে, আবছা আলোতে অস্পষ্ট দেখা গেল টুম্পা বিছানায় আধশোয়া হয়ে ফিসফিস করে কথা বলছে। টুম্পা বলল, "আম্মু তুমি আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাবে?"

টুম্পা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, মনে হয় তার প্রশ্নের উত্তরে তার আম্মু কিছু একটা বলল, উত্তরটা শুনে টুম্পা অধৈর্য হয়ে বলল, "কই? তুমি তো নিচ্ছ না।" আবার একটু বিরতি, তারপর বলল, "কবে নিবে তুমি?" আবার বিরতি, তারপর শুনল, "না আম্মু আমি ভয় পাব না। আমি তোমার সাথে যাব।" এবারে একটু দীর্ঘ বিরতি, বেশ কিছুক্ষণ টুম্পা কথা শুনল, তারপর বলল, "আর একটু থাকো আম্মু, আর একটু, প্লিজ। প্লিজ।" টুম্পা কিছুক্ষণ কথা শুনে বলল, "ঠিক আছে আম্মু, আমি ঘুমাব। তুমি আমাকে বুকের মাঝে চেপে রাখো। আর আদর করো–" নার্গিস শুনতে পেল টুম্পা আদরের এক ধরনের শব্দ করল, তাকে দেখে মনে হতে লাগল কেউ একজন তাকে গভীর ভালোবাসায় বুকে চেপে ধরে নিচু গলায় গান গাইছে। প্রথমে অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনল, তারপর খুব ধীরে ধীরে সে একটা গানের সুর

শুনতে পেল, মনে হলো অনেক দূর থেকে সেটা ভেসে আসছে। করুণ কণ্ঠে সুর করে কেউ একজন ঘুমপাড়ানী গান গাইছে :

আমার টুম্পা সোনা ঘুমায় রে
আমার আদর সোনা ঘুমায় রে
আমার চাঁদের কণা ঘুমায় রে
ঘুমায় রে, সোনা, ঘুমায় রে

খুব ধীরে ধীরে গানের সুরটা মিলিয়ে গেল, নার্গিস দেখল টুম্পা বিছানায় উপুড় হয়ে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে আছে। নিশ্বাসের সাথে সাথে তার ছোট বুকটা উপরে উঠছে নিচে নামছে। নার্গিস তার শরীরে কম্বলটা ভালো করে টেনে দিয়ে মাথার কাছে চুপচাপ বসে রইল।

ভোরবেলা নাস্তা খেতে খেতে জাহিদ বলল, "কী ব্যাপার নার্গিস, তুমি এত চুপচাপ কেন?"

নার্গিস অন্যমনস্কভাবে বলল, "না এমনি।"

"কিছু হয়েছে নাকি?"

"না। কিছু হয় নাই।"

"টুম্পা কী করছে?"

"ঘুমাচ্ছে।"

"এখনো ঘমুচ্ছে!"

"হ্যাঁ। ঘুমাক না, রাতে মনে হয় ঘুমাতে দেরি হয়েছে।"

জাহিদ বলল, "ও।"

জাহিদ চলে যাবার পর নার্গিস চুপচাপ সোফায় বসে রইল। কোনো কিছুতে সে মন দিতে পারছে না।

ঘুম থেকে উঠে টুম্পা তার ছোট একটা ব্যাগে নিজের জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করল। নার্গিস জিজ্ঞেস করল, "কী করছিস টুম্পা?"

"আমার ব্যাগটা গোছাচ্ছি।"

"কেন? তুই কেন তোর ব্যাগ গোছাচ্ছিস?"

টুম্পা কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল। নার্গিস বলল, "বল আমাকে। কেন ব্যাগ গোছাচ্ছিস?"

"আম্মু আমাকে নিয়ে যাবে তো সেই জন্যে।"

নার্গিসের বুকটা ধক করে উঠল, বলল, "আম্মু তোকে কোথায় নিয়ে যাবে?"

"আম্মু যেখানে থাকে সেখানে।"

নার্সিস ভয় পাওয়া গলায় বলল, "আম্মু কোথায় থাকে?"

টুম্পা হাত দিয়ে দেখাল, "অ-নে-ক দূর।"

"সেখানে তুই কেমন করে যাবি?"

"আমি জানি না। আম্মু নিয়ে যাবে।"

নার্গিস টুম্পার কাছে গিয়ে তাকে শক্ত করে ধরে রাখে, ফিসফিস করে বলে, "তুই জানিস তোর আম্মু মরে গেছে?"

টুম্পা ফিক করে হেসে ফেলল, বলল, "তাহলে আম্মু রাত্রিবেলা আমার কাছে কেমন করে আসে?"

সারাটা দিন নার্গিস ছটফট করে কাটাল। রাত্রে ডাইনিং টেবিলে জাহিদ বলল, "তোমার কী হয়েছে নার্গিস? তুমি কোনো কথা বলছ না কেন?"

"কে বলল বলছি না? এই তো বলছি।"

"এটা তো জোর করে বলা।"

নার্গিস একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, "বুঝতে পারছি না জাহিদ। কেমন যেন অস্থির লাগছে।"

জাহিদ হাত বাড়িয়ে নার্গিসের কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "কিছু কী হয়েছে নার্গিস? আমাকে বলো।"

নার্গিস মাথা নাড়ল, বলল, "না। কিছু হয় নি।"

সবাই শুয়ে যাবার পর নার্গিস ঘুরে ঘুরে দরজার সবগুলো ছিটকিনি ভালো করে লাগানো আছে কি-না পরীক্ষা করে টুম্পার ঘরে গেল। বিছানায় গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে, মুখে অস্পষ্ট এক ধরনের হাসি, যেন ঘুমের ভেতর খুব একটা মজার দৃশ্য দেখছে। নার্গিস টুম্পার মাথায় হাত বুলিয়ে তার গালে একটা চুমু দিয়ে নিজের ঘরে চলে এলো।

গভীর রাতে হঠাৎ করে নার্গিসের ঘুম ভেঙে গেল। কিছু একটা হয়েছে, কিন্তু সেটা ঠিক কী নার্গিস বুঝতে পারছে না। নার্গিস কিছুক্ষণ নিঃশব্দে শুয়ে থাকে তারপর উঠে পড়ে। হেঁটে হেঁটে সে টুম্পার ঘরে এলো। বিছানাটি শূন্য, সেখান কেউ নেই। নার্গিস চমকে উঠে বাথরুমে ছুটে গেল, সেখানেও কেউ নেই। নার্গিস চাপা গলায় ডাকল, "টুম্পা! টুম্পা!" কেউ উত্তর দিল না। কি করবে বুঝতে না পেরে বাইরের ঘরে ছুটে গেল, তখন অবাক হয়ে দেখল দরজাটা হাট করে খোলা। উপরের ছিটকিনিটায় টুম্পা নাগাল পাবে না– কিন্তু সে কেমন করে সেটা

খুলেছে? নার্গিস একটা আর্তচিৎকার করে বাইরে ছুটে গেল আর ঠিক তক্ষুনি সে সেই বুনো ফুলের চাপা গন্ধটা পায়। ওপর থেকে গন্ধটা আসছে– তাহলে কী টুম্পা ছাদে উঠেছে? নার্গিস সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে যায়, ছাদের দরজা খুলে এদিক-সেদিক তাকায়। ডান দিকে ছুটে যেতেই সে ভয়ে-আতংকে পাথরের মতোন জমে গেল। টুম্পা ছাদের রেলিংয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসে তার কাপড় উড়ছে, চুল উড়ছে, কুয়াশায় ঢাকা রাতে আকাশে চাঁদের খোলা আলোতে পুরো বিষয়টা দেখতে কী অবাস্তবই না মনে হচ্ছে! মনে হচ্ছে ওটা বুঝি সত্যি নয়, ওটা বুঝি অতি প্রাকৃতিক কোনো দৃশ্য। নার্গিসের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, একটু পা ফসকালেই টুম্পা ছয়তলা ছাদের উপর থেকে নিচে গিয়ে পড়বে।

নার্গিস চাপা গলায় ডাকলো, "টুম্পা!"

টুম্পা ঘুরে তার দিকে তাকাল, বলল, "কী খালামণি?"

"তুই কী করছিস?"

"আমি আম্মুর কাছে যাব। ঐ যে আম্মু নিচে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, আমাকে ডাকছে! আমি লাফ দিব।"

"না। তুই লাফ দিবি না।"

"কেন খালামণি?"

"তোর এখনো যাবার সময় হয় নি। যখন সময় হবে তখন তুই আম্মুর কাছে যাবি। তুই, আমি, আমরা সবাই তোর আম্মুর কাছে যাব।"

টুম্পা মাথা নাড়ল, "না খালামণি, আমি এক্ষুনি যাব।"

নার্গিস তীব্র স্বরে বলল, "না। এখন না। এখন কিছুতেই না। না না।"

হঠাৎ করে বুনো ফুলের অচেনা গন্ধটা কেমন যেন তীব্র হয়ে ওঠে, হিম শীতল একটা বাতাসে তাকে পাক খেয়ে বেড়ায়। নার্গিস মাথা ঘুরে এদিক-সেদিক তাকাল। চাপা গলায় বলল, "শায়লা। আমি জানি তুই এখানে আছিস। আমি জানি। রাক্ষুসী! তুই কেমন করে এটা করছিস? কেমন করে করছিস?"

কোথা থেকে একটা চাপা কান্নার শব্দ ভেসে আসে। নার্গিস হাত তুলে বলল, "কাঁদিস না শায়লা। আমি তোকে কথা দিয়েছিলাম টুম্পাকে আমি দেখে রাখব, তুই আমাকে কথা দিয়েছিলি টুম্পাকে আমার কাছে দিয়ে যাবি। তোর কথা রাখতে হবে শায়লা। আমাকে দে। টুম্পাকে ফিরিয়ে দে।"

চাপা কান্নাটা এবার হাহাকারের মতো শোনায়। নার্গিস মাথা ঘুরিয়ে চারিদিকে তাকায়, তারপর নিচু গলায় বলল, "আমি তোকে দেখতে পাচ্ছি না শায়লা। যদি তোকে দেখতে পেতাম তাহলে তোকে বুকে জড়িয়ে ধরতাম শায়লা, ধরে বলতাম, শায়লা, তোর টুম্পাকে আমি পেটে ধরি নি, কিন্তু বিশ্বাস কর এই

মেয়েটি আমার শরীরের অংশ! তুই যেটুকু ভালোবাসিস আমি তার সমান ভালোবাসতে পারব কী না জানি না– কিন্তু তার চাইতে কম ভালোবাসব না। আমি তোকে কথা দিচ্ছি শায়লা, তুই যেভাবে চেয়েছিলি আমি ঠিক সেভাবে তাকে বড় করব। তুই আমাকে বিশ্বাস কর শায়লা। বিশ্বাস কর! টুম্পাকে ফিরিয়ে দে শায়লা। ফিরিয়ে দে আমার কাছে।"

কথা বলতে বলতে নার্গিস হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল, দুই হাত মুখ ঢেকে সে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো।

তার মাথার উপর ছোট হাতের একটা স্পর্শ পেয়ে নার্গিস মাথা তুলে তাকাল। টুম্পা তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মাথায় বড় মানুষের মতো হাত বুলিয়ে বলল, "তুমি কেঁদো না খালামণি।"

নার্গিস শক্ত করে টুম্পাকে জড়িয়ে ধরে চোখ মুছে বলল, "না, কাঁদব না।"

টুম্পা বলল, "আমাকে কোলে নেবে। খুব শীত করছে।"

"নেব মা।" বলে টুম্পাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে সিঁড়ির দরজার কাছে হেঁটে যেতে থাকে। দরজার কাছে গিয়ে নার্গিস ঘুরে তাকাল। ছাদের শেষ প্রান্তে একটা আবছা ছায়ামূর্তিকে দেখতে পায়। একাকী বিষণ্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে– বাতাসে তার কাপড় উড়ছে, চুল উড়ছে।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সময় নার্গিসের কাঁধে মুখ গুঁজে টুম্পা ফিসফিস করে বলল, "আমার আম্মু কী বলেছে জানো?"

"কী?"

"বলেছে আম্মু হলো আমার আম্মু। আর তুমি হলে আমার মা-মণি।"

"তাই বলেছে?"

"হ্যাঁ।" টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "এখন থেকে আমি তোমাকে মা-মণি ডাকব। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

"মা-মণি, তুমি আজকে আমার সাথে ঘুমাবে? আমাকে হাত দিয়ে ধরে রাখবে?"

"হ্যাঁ মা, রাখব। তোকে আমি সারা জীবন আমার বুকের মাঝে চেপে ধরে রাখব।"

"ঠিক আছে মা-মণি।"

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় নার্গিস টুম্পাকে শক্ত করে ধরে রাখল, দেখে মনে হতে থাকে যেন একটু হাত আলগা করলেই কোথাও বুঝি সে হারিয়ে যাবে।

মরিয়মের গ্রাম

আমার একজন সাংবাদিক বন্ধু আছে, তার নাম রতন। রতনের সাথে পরিচিত হওয়ার পর বলা যেতে পারে আমার জীবনে একটা নূতন মাত্রার যোগ হয়েছে। আগে যখন খবরের কাগজে দেখতাম প্রত্যন্ত কোনো একটা এলাকায় একটা অদ্ভুত জন্তু বের হয়েছে, রাত্রিবেলা সেটা ছোট শিশুদের কামড়ে খেয়ে ফেলছে, তখন সেটা পড়েই আমাকে চুপচাপ বসে থাকতে হতো। এখন আর বিচিত্র খবর পড়ে চুপচাপ বসে থাকতে হয় না, আমি টেলিফোন তুলে রতনকে ডায়াল করে ফেলতে পারি, রতনকে জিজ্ঞেস করতে পারি, "আচ্ছা রতন, খবরের কাগজে এরকম একটা গাঁজাখুরি খবর ছাপানো হয়েছে, ব্যাপারটা কী?"

রতন বলে, "দাঁড়ান স্যার আমি খোঁজ নিয়ে দেখি।"

খোঁজ নিয়ে দেখা যায় অদ্ভুত জন্তুটা একটা শেয়াল, সম্ভবত র‍্যাবিড, কোনো একটা মানুষকে কামড়ে দিয়েছে, সেটাকেই রংচং দিয়ে এরকম জমকালো একটা খবর বানানো হয়েছে! কিংবা যখন পত্রিকায় বিশাল সচিত্র ফিচার দেখি, "নিশ্বাস না নিয়ে পানির তলায় এক ঘণ্টা" আমি রতনকে ফোন করে জিজ্ঞেস করি, "মানুষ পানির তলায় এক ঘণ্টা কীভাবে থাকবে? নিশ্বাস না নিয়ে তো কেউ এক মিনিটও থাকতে পারে না!" রতন বলে, "দাঁড়ান স্যার, দেখি!" কিছুক্ষণের মাঝেই সে পানির তলায় সাঁতারুকে বের করে তার সাথে যোগাযোগ করে দেয়। আমি তাকে বলি, "ভাই আপনি কেমন করে পানির তলায় এক ঘণ্টা থাকেন? নিশ্বাস না নিয়ে তো কেউ এক-দুই মিনিটের বেশি থাকতে পারে না!" সাঁতারু তখন হা হা করে হাসে, বলে, "স্যার সেটা তো সত্যি কথা! আমি পানির তলায় থাকি তাই বলে নিশ্বাস নেই না সেটা তো কখনো বলি না!" আমি জিজ্ঞেস করি, "কেমন করে নিশ্বাস নেন?" সাঁতারু বলে, "হাত দিয়ে পানির ওপর থেকে বাতাস টেনে এনে মুখে দিই! সেইভাবে নিশ্বাস নিই।"

শুনে আমি চমৎকৃত হই, সাঁতারু গায়ের চামড়া দিয়ে পানি থেকে অক্সিজেন নিয়ে নিচ্ছে না জেনেই আমি এক ধরনের স্বস্তি বোধ করি।

শুধু যে আমি রতনকে ফোন করি তা নয়, মাঝে মাঝে রতনও আমাকে ফোন করে। ফোন করে মাঝে মাঝে বলে, "স্যার এক জায়গায় যাবেন?"

আমি জিজ্ঞেস করি, "কোন জায়গায়?"

"সুনামগঞ্জের দিকে একটা গ্রামে?"

"কী আছে সেই গ্রামে?"

"এই গ্রামের সব মানুষ চোর।"

"সব মানুষ চোর?"

"জি, স্যার।"

আমি তখন একদিন সময় করে রতনের সাথে সেই গ্রামে হাজির হই। প্রথম প্রথম মানুষগুলো মাথা নেড়ে অস্বীকার করে, রতন তখন তার নিজস্ব স্টাইলে মানুষগুলোকে চেপে ধরে। মানুষগুলো সেই চাপ বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না। কিছুক্ষণেই তারা সবকিছু স্বীকার করতে শুরু করে। চুরি করার কত রকম টেকনিক আছে আমি তাদের কাছ থেকে প্রথমবার তার একটা ধারণা পাই। নিদাল পাতা নামে একটা পাতা দিয়ে বিড়ি তৈরি করে তার ধোঁয়া গৃহস্থের মুখের ওপর ফুঁ দিয়ে দিলে সেই গৃহস্থ নাকী সারারাত ঘুম থেকে ওঠে না! আরেকবার গিয়ে সেই নিদাল পাতাও নিয়ে আসতে হবে, কেমিস্ট্রির প্রফেসরদের জিজ্ঞেস করতে হবে এই পাতার কী এমন গুণ আছে যে এর ধোঁয়ায় নিশ্বাস নিলে গৃহস্থ ঘুম থেকে উঠতে পারে না!

রতন আমাকে দেশের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকা প্রাচীন মন্দিরে নিয়ে গেছে, (আহা! ভেঙেচুরে মন্দিরগুলোর সে কী দুরবস্থা!) জেলেদের সাথে সমুদ্রে ট্রলারে করে মাছ ধরা দেখতে নিয়ে গেছে (সমুদ্রের ঢেউয়ে বমি করতে করতে আমার বারোটা বাজার অবস্থা!), দেশের যাবতীয় ভণ্ড পীর এবং সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে নিয়ে গেছে (যে যত বড় ভণ্ড তার তেজ তত বেশি!) তার সাথে আমার সবচেয়ে মজার অভিজ্ঞতাগুলো হয়েছে জিন-ভূতের আড্ডায়– সত্যিকারের একটাও এখনো দেখি নি, কিন্তু ভেজালগুলোও কম মজার নয়।

তাই যেদিন রতন আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, এক জায়গায় যাবেন?" আমি খুব উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায়?"

"আগে বলেন যাবেন নাকী!"

"কোথায় যেতে হবে না বললে আমি কেমন করে হ্যাঁ কিংবা না বলি?"

রতন গম্ভীর গলায় বলল, "স্যার জায়গাটা খুবই রিস্কি।"

"কী রকম রিস্ক?"

"সুন্দরবনের কাছাকাছি একটা গ্রামের খোঁজ পেয়েছি, সেই গ্রামের লোকজন তাদের গ্রামের মানুষ ছাড়া অন্য কোনো মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখে না।"

"তাই নাকী?"

"জি স্যার।"

"কেন?"

"সেইটাই তো রহস্য! ভিতরে অনেক বড় ব্যাপার আছে।"

"তারা যদি কারো সাথে যোগাযোগ না করে তাহলে তুমি তাদের সাথে যোগাযোগ করলে কেমন করে?"

"অনেক কষ্টে।" রতন গম্ভীর গলায় বলল, "এই গ্রামের মাতবর কে জানেন?"

"কে?"

"একটা অপদেবতা! পুরো গ্রামকে সে কন্ট্রোল করে।"

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, "ভেরি ইন্টারেস্টিং!"

"জি স্যার, ভেরি ইন্টারেস্টিং।"

"গ্রামের বাইরে একটা জংগলের মতো জায়গায় একটা পাথরের বেদি আছে। গ্রামের মানুষ মাঝে মাঝে সেই বেদির কাছে যায়, তাদের অপদেবতাকে ডাকে, তখন সেই অপদেবতা আসে। এসে দেখা দেয়। উপদেশ দেয়। কথাবার্তা বলে।"

"মজার ব্যাপার তো! খালি চোখে দেখা যায়?"

"আমি নিজে দেখি নাই, কিন্তু যে দেখেছে সে বলেছে যে খালি চোখে দেখা যায়।"

"কী রকম দেখতে?"

রতন রহস্য করে বলল, "মোটামুটি ভয়ংকর। আমি নিজে তো দেখি নাই, খালি বর্ণনাটা শুনেছি। ভয়ংকর বর্ণনা।"

"বলো, বর্ণনাটা। একটু শুনি।"

"না স্যার, নিজের চোখে দেখবেন তাই আমি আর বলতে চাই না।"

আমি মোটামুটি আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আমাদের দেখতে দেবে?"

"না স্যার।"

"তাহলে?"

"গোপনে যেতে হবে। আমি একটা লাইন করেছি। খুব রিস্কি। ধরা পড়লে বিপদ আছে! যদি রাজি থাকেন তাহলে সেই লাইনে ব্যবস্থা করি।"

আমি কোনোরকম চিন্তা না করেই বললাম, "রাজি আছি, তুমি ব্যবস্থা করো।"

রতন বলল, "ধরেই নিয়েছিলাম আপনি রাজি হবেন। তাই আসলে ব্যবস্থা করে ফেলেছি!"

"করে ফেলেছ?"

"জি স্যার। কাল ভোরে রওনা দিব।"

কাজেই পরের দিন খুব ভোরে আমরা রওনা দিলাম।

আজকাল রাস্তাঘাট ভাল হয়েছে তাই খুব ভোরে রওনা দিয়ে সন্ধের ভেতরে মোটামুটি যে গ্রামটাতে যাবার কথা তার কাছাকাছি একটা গ্রামে পৌঁছে গেলাম। তবে ভ্রমণটা খুব সহজ হলো না। শুরুটা ভালই ছিল, বড় এসি বাসে মোটামুটি আরামে কাছাকাছি বড় শহরটাতে চলে গেলাম। বাস থেকে নেমে একটা হোটেলে পাংগাশ মাছের পেটি দিয়ে ভাত খেয়ে উঠেছি একটা মুড়ির টিন লক্করঝক্কর বাসে। সেই বাসে যাত্রা শুরু করার সাথে সাথেই মনে হলো আমার পাংগাশ মাছ বুঝি বের হয়ে আসবে– নেহায়েৎ ঘোরাঘুরি করে অভ্যাস হয়ে গেছে তাই কোনোভাবে সেটাকে সামাল দিলাম! অনেকেই সামাল দিতে পারল না, বাস থেকে মাথা বের করে তারা হড়হড় করে বমি করতে শুরু করে দিল!

বাস থেকে নামার পর যে যানটিতে উঠতে হলো সেটার স্থানীয় নাম ভটভটিয়া। শ্যালো ইঞ্জিন দিয়ে তৈরি করা এই যানটির মতো সার্থক নামকরণ আর কোনো কিছুর হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ভটভট শব্দ করতে করতে এটা খোয়া ওঠা একটা সরু রাস্তা দিয়ে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে যেতে লাগল। ঘণ্টা দুয়েক পর সেটা আমাদের যে জায়গায় নামিয়ে দিয়ে গেল সেটাকে দেখেই মনে হয় যে বাংলাদেশের মূল এলাকা থেকে মোটামুটি বিচ্ছিন্ন একটা জায়গায় চলে এসেছি।

বাকি অংশ যেতে হবে হেলিকপ্টারে। সাইকেলের ক্যারিয়ারে বালিশ বেঁধে সেখানে বসিয়ে নেয়ার এই প্রক্রিয়াটাকে যে প্রথম হেলিকপ্টার নাম দিয়েছে তাঁর রসবোধের প্রশংসা না করে পারা যায় না। লিকলিকে একজন মানুষ যখন তার প্রাচীন হারকিউলেস সাইকেল নিয়ে আমার কাছে হাজির হলো তখন আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। আমি রতনকে বললাম, "কতো দূর যেতে হবে? চলো হেঁটে চলে যাই!"

রতন গলা নামিয়ে বলল, "উঁহু। হেঁটে যেতে চাই না– মানুষজনের চোখে পড়ে যাব! যথাসম্ভব গোপনে যেতে চাই।"

কাজেই আমাকে হেলিকপ্টারে উঠতে হলো। লিকলিকে মানুষটা বলল, "কুনো ভয় পাবেন না স্যার। আমি আট বছর ধরে হেলিকপ্টার চালাই!"

আমার মতো এরকম বড়সড় একজন মানুষকে পিছনে বসিয়ে সাইকেল চালাবে চিন্তা করেই আমার অস্বস্তি হচ্ছিল, ঠিক শুরু করার আগে দেখতে পেলাম সে তার সামনের রডে আরো একজন প্যাসেঞ্জার বসিয়ে নিল!

হেলিকপ্টারে করে গ্রামের মেঠোপথে আমার সেই যাত্রার কোনো তুলনা নেই। লিকলিকে মানুষটার জন্যে আমার খুব মায়া হচ্ছিল, কিন্তু মনে হলো আট বছর ধরে হেলিকপ্টার চালিয়ে চালিয়ে তার পায়ের মাংসপেশিতে এক ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়ে গেছে, সে বাড়তি দুইজনকে সাইকেলে বসিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সাইকেল চালিয়ে নিতে পারে, তার কোনো পরিশ্রম হয় না।

যখন মনে হলো শরীরের সব হাড়গোর খুলে খুলে আসবে তখন আমাদের হেলিকপ্টার একটা ছোট গ্রামের কাছে একটা বড় বটগাছের নিচে থামাল। সেখানে আমাদের জন্যে একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ অপেক্ষা করছিল– মানুষটার নাম জালাল। রতন হেলিকপ্টারের ভাড়া মিটিয়ে মধ্যবয়স্ক মানুষটাকে বলল, "চল, জালাল।"

আমি আর রতন তখন জালালের পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করি। জালাল গ্রামের নিরিবিলি পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে আমাদেরকে সাথে নিয়ে নদীর তীরে একটা ছোট বাড়িতে এনে হাজির করল। বাড়িতে মনে হয় কেউ নেই, বাইরের দিকে ছোট একটা ঘরে আমাদের ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, "আপনারা বিশ্রাম নেন। আমি খাবারের ব্যবস্থা করি।"

রতন বলল, "খুব খিদে পেয়েছে। কী খাওয়াবে বলো।"

জালাল বলল, "গ্রামের ব্যাপার, ভাল-মন্দ তো কিছু খাওয়াতে পারব না। দেখি একটা মুরগি জোগাড় করতে পারি কী-না।"

রতন বলল, "দেখো মুরগির খোঁজ করতে গিয়ে কেউ যেন আমাদের খোঁজ না পেয়ে যায়!"

জালাল তার ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসার ভঙ্গি করে বলল, "ভয় পাবেন না। কেউ খোঁজ পাবে না। আপনারা ঘর থেকে বের হবেন না, শুয়ে রেস্ট নেন। রাত এগারোটার দিকে ভাটায় টান দিবে তখন বের হব।"

সারাদিন মুড়ির টিন, ভটভটিয়া আর হেলিকপ্টারে এসে পুরো শরীরটা নেতিয়ে পড়েছে। আমি ঘরের ভেতর চৌকিতে পেতে রাখা তেল চিটচিটে একটা বিছানায় মাথা রেখে প্রায় সাথে সাথেই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লাম।

ঘণ্টা দুয়েক পর রতন আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল– আমার কয়েক মুহূর্ত লাগল বুঝতে আমি কোথায়। দূরে কোথায় জানি শেয়াল ডেকে উঠল আর ঠিক তখন আমার মনে পড়ল আমি রতনের সাথে একটা গ্রামে গিয়ে অপদেবতা দেখতে এসেছি। সারাটি দিন নানা ধরনের উত্তেজনায় কেটে গেছে– এখন এই নিশুতি রাতে আবছা অন্ধকার একটা ঘরের ভেতর বসে শেয়ালের ডাক শুনতে শুনতে বুকের ভেতরটা কেমন জানি কেঁপে উঠল।

রতন নিচু গলায় বলল, "স্যার উঠেন। খাবার এনেছে, একটু খেয়ে নেন।"

বিছানার উপরেই দস্তরখানা বিছিয়ে খাবারের আয়োজন করেছে। গরম ভাত, মোরগের ঝোল এবং মাশকালাইয়ের ডাল। খিদেয় পেটের নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাবার অবস্থা হয়েছিল, তাই সে মোটা লাল চালের ভাতের সাথে ভয়ংকর ঝাল মোরগের ঝোলকে রীতিমতো অমৃত বলে মনে হলো।

খাওয়া শেষে জালাল থালা-বাসন উঠিয়ে নিতে নিতে বলল, "আপনারা রেডি হন। ভাটার টান দিয়েছে, এখন রওনা দিতে হবে।"

রতন বলল, "আমরা রেডিই আছি।"

কাজেই কিছুক্ষণের মাঝেই আমরা নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হলাম। বড় বড় ঝাপড়া কয়েকটা গাছের নিচ দিয়ে হেঁটে হেঁটে নদীর ঘাটে বেঁধে রাখা একটা নৌকার মাঝে উঠেছি। নৌকার ছইয়ের নিচে গুটিশুটি মেরে বসার প্রায় সাথে সাথেই জালাল নৌকাটাকে লগি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে নদীর মাঝে নিয়ে আসে। লগিটাকে ছইয়ের ভেতর গুঁজে রেখে সে বৈঠাটা টেনে নিয়ে নৌকাটার হাল ধরে স্রোতের সাথে যেতে শুরু করল। আমি রতনকে জিজ্ঞেস করলাম, "আমরা কোথায় যাচ্ছি, কী করছি একটু বলবে না?"

রতন বলল, "হ্যাঁ। এখন ভাল করে শুনে নিতে হবে।" তারপর জালালের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "জালাল, এখন বলো কী করতে হবে।"

জালাল ফোঁস করে একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "কাজটা খুব ভয়ংকর। আমারে যদি বলেন তাহলে বলি, এটা করে কোনো কাজ নাই– আমরা এখনো ফিরে যাই।"

রতন বলল, "আরে ধুর! ফিরে যাবার জন্যে এতদূর থেকে এসেছি নাকী? কী করতে হবে সেইটা বলো।"

জালাল বলল, "আমরা যে গ্রামে যাচ্ছি তার নাম খুকসা বাড়ি।"

"কী বাড়ি?"

"খুকসা বাড়ি।"

"আজব নাম।"

জালাল বলল, "প্রথম বার শুনলে সব নামই আজব।"

কথাটা অবশ্য জালাল মিথ্যা বলে নি! রতন মাথা নাড়ল, বলল, "তা ঠিক। এখন বলো, খুকসা বাড়ির রহস্যটা কী?"

"খুকসা বাড়ি গ্রামটা ছোট, সেখানে কত ঘর মানুষ থাকে সেটা পরিষ্কার করে কেউ জানে না। এই গ্রামের তিন দিকে নদী এক দিকে জঙ্গল, যাওয়া খুব মুশকিল। সবচেয়ে বড় কথা এই গ্রামের মানুষ বাইরের গ্রামের মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখে না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ছেলেমেয়েদের স্কুল আছে?"

"জে না, নাই।"

"মানুষগুলো কী করে?"

"কেউ কেউ মাছ ধরে, কেউ কেউ সুন্দরবনে কাঠ কাটে, মধু তুলে। বেশিরভাগই মনে হয় কিছু করে না, ঘরে বসে থাকে।" জালাল বৈঠা দিয়ে নৌকাটাকে স্রোতের মাঝে ধরে রেখে বলল, "এই গ্রামের মানুষ অন্য গ্রামে বিয়ে পর্যন্ত করে না, এই হচ্ছে অবস্থা।"

"কেউ যদি তাদের গ্রামে যায়?"

"যাওয়া কঠিন। যদি কেউ যায় তাহলে কেউ তার কথা বলে না। সবাই ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে।"

"আশ্চর্য।"

"এইটা আর কী আশ্চর্য? আশ্চর্য হলো তাদের গ্রামের দানো।"

"দানো?"

জালাল বলল, "জে। দানো। এই গ্রামের মানুষের মাঝে কোনো চুরি-ডাকাতি নাই, কোনো বিরোধ নাই। সবাই মিলেমিশে থাকে এই দানোর কারণে।"

"দানোটা কী?"

"সেইটাই তো রহস্য। কেউ জানে না। গ্রামের মানুষ কোনো কোনো রাতে পূজা দেয়, তখন দানো আসে, কথাবার্তা বলে।"

"আজ রাতে দানো আসবে?"

"জে। আজ আসবে।" জালাল নৌকাটাকে স্রোতের মাঝে ধরে রাখতে রাখতে আপন মনে বলল, "কী ঘুটঘুটে অন্ধকার! আর ভাটার কী টান দেখেছেন?"

আমি অন্ধকারটা দেখতে পেলাম ভাটার টানটা অবশ্যি বুঝতে পারলাম না। নৌকার ছইয়ের ভেতর থেকে বাইরে ভাল দেখা যায় না, তবে আকাশের দিকে তাকালে অসংখ্য নক্ষত্র দেখা যায়– পরিষ্কার আকাশে নক্ষত্রগুলো স্ফটিকের মতো ঝকঝকে করছে। আমি জালালকে জিজ্ঞেস করলাম, "আমাদের প্ল্যানটা কী?"

"আমি নৌকাটাকে লাগাব উত্তর পাশে। সেইখানে একটা জংলা মতন জায়গা আছে। সাবধানে এই জংলা জায়গাটা পার হলে আপনারা গ্রামের সড়কটায় উঠে পড়বেন। সড়কে উঠেই পুবদিকে যাবেন–"

"পুব-পশ্চিম তো আমি বুঝি না–" রতন বাধা দিয়ে বলল, "ডানে না বামে সেইটা বলো।"

"ডান দিকে। সড়কে ওঠার পর ডান দিকে হাঁটতে থাকবেন। তখন দেখবেন আরো গ্রামের মানুষ হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। কেউ কোনো কথা বলে না, কেউ কারো দিকে তাকায় না, তাই কোনো সমস্যা হবার কথা না। সবাই মন্ত্র পড়তে পড়তে হাঁটে। খালি একটা জিনিস মনে রাখবেন–"

"কি জিনিস?"

জালাল আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি আপনার চশমাটা খুলে রাখবেন। অন্ধকারের মাঝেও চশমা দেখা যায়। গ্রামের মানুষ কিন্তু চশমা পরে না!"

"চশমা খুললে আমি দেখব কেমন করে?"

জালাল বলল, "যতটুকু দেখেন ততটুকুই। দেখবেন কম শুনবেন বেশি। তা ছাড়া–"

"তা ছাড়া কী?"

"ঘুটঘুটে অন্ধকার, দেখার তো বেশি কিছু নাই–"

"তাই বলে–"

জালাল বাধা দিয়ে বলল, "স্যার, গ্রামের লোক যদি বুঝতে পারে আপনারা বাইরের মানুষ তাদের সাথে দানো দেখতে গেছেন তাহলে বিপদ আছে।"

"কী রকম বিপদ?"

"বছর চারেক আগে একটা লাশ ভেসে উঠেছিল। কার লাশ, কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না। লাশের সারা শরীর ঠিক আছে, শুধু চোখ দুটো নাই, কীসে যেন খেয়ে ফেলেছে।"

জালালের কথা শুনে আমার শরীরে কেমন যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে। শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর?"

"লাশকে গ্রামের মানুষ মাটিচাপা দিল–"

"পুলিশকে জানায় নি?"

"পুলিশ?" জালাল আনন্দহীন এক ধরনের হাসির শব্দ করে বলল, "এই সব গ্রামে পুলিশ-মিলিটারি কোথায় পাবেন? এইখানে কোনো আইন-কানুন নাই। গ্রামের মানুষ যেটা করে সেইটাই আইন।"

"সর্বনাশ!"

জালাল বলল, "সর্বনাশের কিছু নাই। যেখানে যে নিয়ম।"

"কার লাশ ছিল সেইটা কখনো জানা যায় নাই?"

মাস খানেক পরে কিছু লোক এসে খোঁজখবর নিচ্ছিল। কোন পত্রিকার সাংবাদিককে নাকী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারা যে বর্ণনা দিল তার সাথে মিলে যায়।"

রতন জিজ্ঞেস করল, "তোমরা সন্দেহ করছ খুকশাবাড়ির লোকেরা মেরে ফেলেছে?"

"জে। আপনাদের মতন দেখতে গিয়েছিল, ধরা পড়ে গেছে। কাজেই সাবধান। আপনারা যেন ধরা না পড়েন। লুঙ্গি পরে যাবেন। খালি পা হলে ভাল, যদি কিছু পরতেই হয় তাহলে স্পঞ্জের স্যান্ডেল। চাদর মুড়ি দিয়ে থাকবেন। মরে গেলেও মুখ থেকে একটা শব্দ বের করবেন না।"

রতন আমাকে জিজ্ঞেস করল, "স্যার– ভেবে দেখেন এত বড় রিস্ক নেবেন কী না।"

আমি বললাম, "তোমার ভয় লাগছে?"

"জে না। আমার এত ভয়ডর নাই।"

"আমারও নাই।"

"ঠিক আছে তাহলে!"

জালাল বলল, "ঠিক আছে স্যার। আমরা খুকশাবাড়ি গ্রামের কাছাকাছি চলে এসেছি, কাজেই এখন কোনো কথাবার্তা নাই। রাত্রিবেলা অনেক দূর থেকে কথা শোনা যায়।"

কাজেই আমরা চুপচাপ বসে রইলাম, জালাল খুব নিঃশব্দে নৌকাটাকে এগিয়ে নিয়ে একটা জায়গায় থামাল। নদীর ধারে ঝাঁকড়া কিছু গাছ, তাদের ডাল পানিতে ঝুঁকে পড়েছে। নৌকাটাকে তার ভেতর নিয়ে সে দড়ি দিয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে বেঁধে ফেলল। এতক্ষণ নক্ষত্রের আলোতে তবুও আবছা মতোন কিছু একটা দেখা যাচ্ছিল, এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জালাল

আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, "নামেন স্যার।"

"অন্ধকারে কিছুই তো দেখি না।"

"একটু পরেই চাঁদ উঠবে।"

যখন চাঁদ উঠবে তখন আলো হবে কিন্তু এই মুহূর্তে তো কিছুই দেখি না। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মাঝে নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে একটা লুঙ্গি পরে নিলাম। জুতো খুলে পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরেছি। চশমা খুলে রাখলাম শার্টের পকেটে, তারপর একটা চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে রওনা দিলাম। ঠিক রওনা দেওয়ার আগে জালাল ফিসফিস করে বলল, "আমি ঠিক এইখানে অপেক্ষা করব– আপনারা দানো দেখে আসেন।"

আমি আর রতন তখন নদীর ঘাট থেকে উপরের দিকে উঠতে শুরু করি। জংলা জায়গার ভেতর ঝোপঝাড়, ছোট-বড় গাছ, তার ভেতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে শেষ পর্যন্ত সড়কটার কাছে পৌঁছেছি। জালালের কথা সত্যি, সেই সড়ক দিয়ে একটু পরে পরেই এক-দুইজন মানুষ হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। কেউ কোনো কথা বলে না কিন্তু মনে হয় শোনা যায় না এরকম চাপা স্বরে গুনগুন করে সুর করে কিছু বলছে। কথাগুলো শোনা যায় না কিন্তু বলার ধরন দেখে বোঝা যায় কোনো এক ধরনের মন্ত্র জপছে।

সড়কটা যখন একটু ফাঁকা হলো তখন আমি আর রতন সড়কে উঠে হাঁটতে শুরু করে দিই– আমাদের সামনে এবং পিছনে ঠিক আমাদের মতো লোকজন হাঁটছে, কেউ কোনো সন্দেহ করল না। কিছুক্ষণের মাঝেই পিছন থেকে কিছু মানুষ এসে আমাদের ধরে ফেলল– তারা চাপা স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে হাঁটতে থাকে– আমরাও পা চালিয়ে তাদের সাথে হাঁটতে থাকি।

সড়কটা থেকে একটা ছোট মেঠোপথ একট জংগলের মতো জায়গায় ঢুকে গেছে। মানুষগুলোর পিছনে পিছনে আমরা সেখানে ঢুকে গেলাম। খানিক দূর যাবার পর হঠাৎ একটা ফাঁকা জায়গায় হাজির হলাম। সেখানে প্রায় জনা পঞ্চাশেক মানুষ গোল হয়ে বসে আছে। তাদের ঠিক মাঝখানে একটা বড় বেদির মতো, অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না কিন্তু মনে হয় সেটা একটা বড় পাথরের বেদি। এই রকম গ্রামে এত বড় পাথরের বেদি কেমন করে এলো?

আমি আর রতন অন্যান্য মানুষের সাথে বসে পড়লাম। আমাদের সামনে-পিছনে এবং চারপাশে মানুষ, সবাই তখন মাথা দুলিয়ে কিছু একটা মন্ত্র পড়ছে, মন্ত্রের সব কথা বোঝা যায় না, শুধু শেষ অংশটুকু বোঝা যায়। দুর্বোধ্য কথাগুলো উচ্চারণ করে সবাই মাথা দুলিয়ে বলে, "আয় আয় আয়রে।"

কারো মনে যেন কোনো সন্দেহ না হয় সেজন্যে আমরাও সবার মতো মন্ত্রোচ্চারণ করার মতো ভঙ্গি করে একটু পরে পরে মাথা দুলিয়ে ডাকতে লাগলাম, "আয় আয় আয়রে! আয় আয় আয়রে!"

কাকে আসতে বলছি তখনো আমরা জানি না। যদি জানতাম তাহলে তাকে আসতে বলতাম কী না সন্দেহ আছে!

আমাদের চারপাশে বসে থাকা মানুষগুলোর মন্ত্রোচ্চারণ ধীরে ধীরে আরো দ্রুতলয়ে উঠে যায়, সবাই মাথা নাড়তে থাকে, হাত-পা ঝাঁকাতে থাকে। দেখে মনে হয় এক ধরনের মাদকতায় ভর করেছে। সামনে কোনো একটা জায়গা থেকে তখন ঢাকের শব্দ ভেসে আসে, তার সাথে সাথে এক ধরনের বিচিত্র বাঁশির শব্দ। আমরা দেখতে পেলাম পাথরের বেদির সামনে কিছু মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে অঙ্গভঙ্গি করে নাচছে। মাটির ভাঁড়ে করে কোনো এক ধরনের পানীয় মানুষগুলোর কাছে দেয়া হতে থাকে, সবাই এক চুমুক খেয়ে সেটা পাশের জনের হাতে ধরিয়ে দেয়। এক সময় আমার পাশের মানুষটি একটা মাটির ভাঁড় থেকে এক চুমুক খেয়ে আমার হাতে ধরিয়ে দেয়। আমি চুমুক দিয়ে খাবার ভান করে সেটা রতনের হাতে ধরিয়ে দিলাম। তরলটা সম্ভবত ভাত চোলাই করে তৈরি করা এক ধরনের মদ, ঝাঁঝালো বোটকা গন্ধে নাড়ি উল্টে আসতে চায়।

দেশি মদের কারণেই হোক আর অন্য কোনো কারণেই হোক মানুষগুলোর ভেতরে এক ধরনের উন্মাদনার ভাব চলে আসছে, ঢাকের শব্দের তালে তালে তারা দুলে দুলে হাত-পা নেড়ে কোনো একটা অশরীরীকে ডাকতে থাকে।

ঠিক এরকম সময় হঠাৎ চারিদিক আলো হয়ে এলো, আমি প্রথমে ভেবেছিলাম বুঝি কেউ কোনো আলো জ্বালিয়েছে– ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম আসলে সেরকম কিছু নয়, আকাশে যে চাঁদটা ওঠার কথা ছিল সেটা অনেকক্ষণ আগেই উঠে গিয়েছিল, আমরা বুঝতে পারি নি। চাঁদটা আকাশের উপরে ওঠে। হঠাৎ করে বড় বড় গাছগুলোর উপর দিয়ে তার জোছনার আলোটা এসে এই খালি জায়গাটার উপরে পড়েছে। জোছনার আলো যে এরকম তীব্র হতে পারে এখানে আসার আগে আমি বুঝতে পারি নি। হঠাৎ করে আলো হওয়ার সাথে সাথে মানুষগুলো যেন পাগলের মতো হয়ে গেল, তারা হাত-পা ছুড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে চিৎকার শুরু করতে থাকে। এরকম সময় আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বিচিত্র দৃশ্যটা দেখতে পেলাম। দেখলাম চারপাশের গাছগুলো দুলতে শুরু করেছে, পরিষ্কার আকাশে এতটুকু মেঘ নেই কিন্তু মনে হয় প্রচণ্ড ঝড়ে গাছগুলো উথাল-পাথাল হয়ে নড়ছে। বিচিত্র এক ধরনের অশরীরী শব্দ ভেসে আসে, মনে হয়

বহুদূর থেকে কিছু একটা বুঝি ছুটে আসছে। সবকিছু মিলিয়ে বনের ভেতরে হঠাৎ করে ছোট এই ফাঁকা জায়গাটাতে মনে হয় একটা ভয়ংকর ব্যাপার ঘটতে শুরু করে।

আমরা অবশ্যি তখনো সত্যিকারের ভয়ংকর ব্যাপারটি দেখি নি। হঠাৎ করে সবকিছু যেন হঠাৎ নিঃশব্দ হয়ে গেল, একটু আগে যে গাছগুলো দুলছিল সেগুলোও হঠাৎ থেমে গেল, যে মানুষগুলো উন্মত্তের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে চিৎকার করছিল তারা সবাই হঠাৎ করে চুপ করে গেল। নৈঃশব্দ যে কত ভয়ংকর হতে পারে এই প্রথমবার আমি সেটা বুঝতে পারলাম। বাতাসে হঠাৎ বিচিত্র এক ধরনের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল, কর্পুরের গন্ধের থেকেও তীব্র এবং ঝাঁঝালো গন্ধ। সাথে সাথে সবগুলো মানুষ মাথা নুইয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, কী হয় দেখার জন্যে আমার খুব কৌতূহল হচ্ছিল কিন্তু সব মানুষ মাথা নুইয়ে ঝুঁকে পড়ে আছে তাই আমি আর রতন দুজনেই মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইলাম।

ঠিক তখন আমরা একটা কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। কমবয়সি একটা মেয়ের কান্না, বুকভাঙা হাহাকারের মতো কান্না। মাথা তুলে দেখাটা খুব বিপজ্জনক হয়ে যাবে জেনেও আমি মাথা তুলে তাকালাম। আগে লক্ষ্য করি নি পাথরের উঁচু বেদির কাছে একটা গাছের সাথে একটা মেয়েকে বেঁধে রেখেছে। সেই মেয়েটি ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে কাঁদছে।

একজন বুড়ো মানুষ তখন উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত উপরে তুলে দুর্বোধ্য কিছু মন্ত্র পড়ল তারপর তার হাতের একটা মশালে আগুন জ্বালিয়ে নিল। আগুনের শিখাটা দপদপ করে কাঁপতে থাকে, সেই শিখায় সব কিছুর লম্বা ছায়া পড়ে আর সেই ছায়াগুলো আগুনের শিখার সাথে সাথে কাঁপতে থাকে। পুরো দৃশ্যটি এক ধরনের ভয়ংকর অতিপ্রাকৃত দৃশ্য এবং সেটা দেখে আমার বুকের ভেতর কেঁপে ওঠে।

বুড়ো মানুষটি হাতের মশালটা নিয়ে মেয়েটার দিকে এগিয়ে যায় এবং আমি তখন হঠাৎ করে ভয়ংকর আতংকে শিউরে উঠি। মশালের আলোতে এই প্রথমবার দেখতে পেলাম মেয়েটার পায়ের কাছে শুকনো লাকড়ি স্তূপ করে রাখা, আর আরেকজন মানুষ একটা প্লাস্টিকের বোতল থেকে সেই শুকনো লাকড়িতে একটা তরল ঢালছে, তরলটা নিশ্চয়ই পেট্রোল কিংবা কেরোসিন। শুকনো লাকড়িতে যেন দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠে সেই জন্যে এই কেরোসিন। সবার সামনে এই মেয়েটিকে পুড়িয়ে মারা হবে! যে ভয়ংকর অপদেবতাকে মানুষগুলো ডেকে আনছে তাকে ডেকে আনার প্রক্রিয়ার এটি নিশ্চয়ই একটা অংশ।

বুড়ো মানুষটা মশালটা নিয়ে মেয়েটার দিকে আরো কয়েক পা অগ্রসর হলো, সাথে সাথে মেয়েটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল, "আগুন দিও না। আমারে আগুন দিও না। আমারে মেরো না। তোমাদের কসম লাগে, দোহাই লাগে– আমারে ছেড়ে দাও।"

বুড়ো মানুষটা ধমক দিয়ে বলল, "চুপ কর মরিয়ম। তোর চৌদ্দগুষ্ঠির ভাগ্য তাই মাগাবু দানোরে খসম হিসেবে পাবি–"

"চাই না। আমি চাই না–" মেয়েটি চিৎকার করে বলল, "আমারে বাঁচাও। তোমরা বাঁচাও। কসম লাগে–"

বুড়ো মানুষটা আবার চিৎকার করে ধমক দিল, "চুপ কর হতভাগী। চুপ কর–"

মানুষটার মশালটা ঠিক যখন মেয়েটার পায়ের কাছে স্তূপ করে রাখা লাকড়ির মাঝে স্পর্শ করতে যাচ্ছিল তখন আমার কী হলো জানি না– আমি লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললাম "এই যে! এই যে– আপনি থামেন– থামেন আপনি!"

জঙ্গলের মাঝে উবু হয়ে থাকা শ' খানেক মানুষ অবিশ্বাসের এক ধরনের শব্দ করে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি কী করছি ঠিক বুঝতে না পেরেই এক পা এগিয়ে গিয়ে বললাম, "আপনি একটা মেয়েকে এভাবে পুড়িয়ে মারতে পারেন না। কিছুতেই মারতে পারেন না!"

বুড়ো মানুষটা কয়েক মুহূর্ত কেমন জানি হতবুদ্ধি হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর অবাক হয়ে বলল, "আপনি কেডা? আমাদের এইখানে আপনি কেমন করে এসেছেন?"

"আমি যেই হই না কেন–" আমি গলা উঁচিয়ে বললাম, "এই মেয়েটাকে ছেড়ে দেন। এক্ষুনি ছেড়ে দেন।"

"যদি না ছাড়ি?"

"তাহলে এই গ্রামের যত মানুষ আছে তাদের সবার বাকি জীবন জেলখানার ভাত খেতে হবে।"

বুড়ো মানুষটা খানিকটা ভ্যাবাচেকা খেয়ে বলল, "কী বলে এই লোক?"

বসে থাকা মানুষগুলোর অনেকেই এবারে উঠে দাঁড়াল, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি তারা ক্রুদ্ধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বুড়ো মানুষটা এবারে মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "ধর! এই মানুষটারে ধর–"

মানুষগুলো হৈ হৈ করে আমার দিকে ছুটে আসছিল, কিন্তু তার আগেই রতন

তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠেছে, আমি অবাক হয়ে দেখলাম তার হাতে একটা রিভলবার। হাতটা উপরে তুলে বলল, "কেউ এক পা সামনে আসলে আমি খুলি ফুটো করে দেব। খবরদার।"

রতনের কাছে রিভলবার কোথা থেকে এসেছে সেটা নিয়ে আমার ভাবার সময় নাই– আমি তখন প্রায় ছুটে গাছে বাঁধা মেয়েটার কাছে গেলাম। দুই হাত পিছনে নিয়ে বেঁধে রেখেছে– একটা চাকু থাকলে সহজে দড়িটা কেটে ফেলা যেত কিন্তু এখন আমি চাকু কোথায় পাব? কোনোমতে টানাটানি করে দড়ির বাঁধনটা একটু ঢিলে করতেই মরিয়ম নামের মেয়েটা টান দিয়ে তার হাতকে দড়ির বাঁধন থেকে বের করে আনল।

ঠিক কী ঘটছে মানুষগুলো তখনো পরিষ্কার করে বুঝতে পারছে না, সবাই মিলে ছুটে আসতে চাইছিল কিন্তু রতন একাই তার রিভলবার দিয়ে তাদের ঠেকিয়ে রাখল।

আমি মেয়েটার হাত ধরে সরিয়ে নিয়ে বললাম, "তুমি আমাদের নদীর ঘাটে নিয়ে যেতে পারবে?"

"কোন দিকের ঘাটে? উত্তরের না পুবের?"

"উত্তরের।"

"পারব।"

"চলো তাহলে, নিয়ে যাও, দেরি করো না।"

"আসেন আমার সাথে–"

আমি রতনকে ডাকলাম, "রতন তাড়াতাড়ি চল–"

রতন তার রিভলবারটা মানুষগুলোর দিকে তাক করে রেখে হুংকার দিয়ে বলল, "খবরদার কেউ যদি কাছে আসে খুন করে ফেলব!"

মানুষগুলো রতনের হুংকারে ভয় পেয়ে শেষ পর্যন্ত থেমে থাকত কী-না জানি না– কিন্তু ঠিক তখন বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একটা আলো ঝলসে উঠল, আমি অবাক হয়ে দেখলাম পাথরের বেদির ওপর একটা বিশাল ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। বীভৎস একটা মুখমণ্ডল, যেখানে মুখ থাকার কথা সেখানে কালো একটা গহ্বর। চোখের জায়গায় দুটো গর্ত কিন্তু সেই অন্ধকার গর্ত দুটো স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

ভয়াবহ আতংকে আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু বেঁচে থাকার একটা আদিম প্রবৃত্তির জন্যেই মনে হয় আমি মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম না। মেয়েটার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললাম, "চলো, তাড়াতাড়ি চলো।"

মেয়েটা বলল, "চলেন!"

কেউ কিছু বোঝার আগে মেয়েটার পিছু পিছু আমি আর রতন জংগলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলাম।

মেয়েটার পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে আমরা নদীর ঘাটে হাজির হলাম। জালালের নাম ধরে চাপা গলায় দুই একবার ডাকতেই জালাল তার হাতের টর্চ লাইট জ্বালিয়ে আমাদের সংকেত দিল। আমরা ছুটে গিয়ে নৌকায় উঠতেই জালাল নৌকাটাকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে নামিয়ে দিল।

আমরা যখন নদীর মাঝামাঝি পৌঁছেছি তখন দেখতে পেলাম খুকশাবাড়ি গ্রামের মানুষগুলো নৌকা করে আমাদের খুঁজতে বের হয়েছে!

আমি রতনকে বললাম, "রতন, তোমার রিভলবার দিয়ে একটা ফাঁকা গুলি করো তাহলে মানুষগুলো আর আসবে না।"

রতন বলল, "কেমন করে ফাঁকা গুলি করব? এটা তো খেলনা রিভলবার।"

"খেলনা?" আমি চোখ তুলে বললাম, "তুমি খেলনা রিভলবার দিয়ে এতোগুলো মানুষকে ভয় দেখিয়েছ?"

রতন মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ! ভয় দেখানো সোজা! আমরা কেমন ভয় পেয়েছি দেখলেন না?"

আমরা নদীর ওপারে পৌঁছে গেলাম আধা ঘণ্টার মাঝেই। পৌঁছে আর দেরি করি নি, সেই রাতেই হেঁটে আমরা এলাকা থেকে পালিয়ে এলাম।

একটা মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্রে মরিয়মকে দিয়ে এসেছি। যারা কেন্দ্রটি চালান তাদের সাথে আমার পরিচয় আছে, তাই মরিয়ম কে, কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে সেগুলো নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করল না। মরিয়ম হাসি-খুশি মেয়ে, নূতন জায়গায় বেশ ভালই মানিয়ে নিয়েছে।

মরিয়ম তার গ্রামে আর ফিরে যেতে চায় নি।

মড়া

মাইক্রোবাসের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আমি ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললাম। আমি জানি অনুরোধে সবাইকেই কখনো না কখনো ছোটখাটো ঢেঁকি গিলতে হয়, শুধু আমার বেলা যেটা ঢেঁকি হবার কথা সেটা কীভাবে কীভাবে জানি একটা জাহাজ হয়ে যায়। যেমন আজকের ব্যাপারটা– আমার স্কুল জীবনের একজন বন্ধুর বাসায় বিকালে চা খেতে যাবার কথা ছিল। কীভাবে কীভাবে কয়েকজন মিলে চা খাওয়ার পরিকল্পনাটা চা বাগানে বেড়াতে যাওয়া হয়ে গেছে আমি জানতেও পারি নি! যখন জানতে পেরেছি তখন আর পিছিয়ে যাবার উপায় নেই। তাই এখন সকাল আটটার সময় আমি মাইক্রোবাসে এক দল অপরিচিত মানুষের সাথে বসে বসে একটা চা বাগানে যাচ্ছি। আজ ছুটির দিন, আমার দশটা পর্যন্ত ঘুমানোর কথা ছিল, ঘুম থেকে উঠে ধীরেসুস্থে চা-নাস্তা খেয়ে সোফায় কাত হয়ে শুয়ে রগরগে একটা উপন্যাস পড়ার কথা ছিল। পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে আমি আবার ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললাম।

দীর্ঘ নিশ্বাসটা নিশ্চয়ই একটু জোরে হয়ে গিয়েছিল কারণ আমার ঠিক পাশে বসে থাকা গোমড়া মুখের মানুষটা আমার দিকে ঘুরে তাকাল। আমার চোখে চোখ পড়তেই মানুষটা মুখে একট হাসি ফোটানোর চেষ্টা করে বলল, "আপনি নিশ্চয়ই হামিদের বন্ধু?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "আমরা স্কুলে একসাথে পড়েছি। আমার নাম জাফর ইকবাল।"

মানুষটা মাথা নেড়ে বলল, "আমি হামিদের সাথে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি। আমার নাম আবিদ হাসান। হামিদ আমাকে জোর করে ধরে এনেছে। আপনাকে?"

আমি হাসার চেষ্টা করে বললাম, "ঠিক জোর করে না– বলা যেতে পারে কায়দা করে ধরে এনেছে!"

আবিদ হাসান নামের মানুষটা হা হা করে হেসে বলল, "এটা হচ্ছে হামিদের স্টাইল। যখন যেটা দরকার। কোথাও কায়দা কোথাও জোর–"

হামিদ সামনের সিটে বসেছিল, নিজের নামটা শুনতে পেয়ে বলল, "কী বলছিস আমার নামে?"

আবিদ হাসান বলল, "নূতন কিছু না।"

"তোর জাফর ইকবালের সাথে পরিচয় হয়েছে?"

"হয়েছে।"

"হ্যাঁ, পরিচয় করে নে। জাফর ইকবাল খুবই ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার।"

আমি একটু দুশ্চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আমি ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার!"

"অবশ্যই। মনে নাই স্কুলে পড়ার সময় তুই একবার রাগ করে গাছে উঠে বসে থাকলি? বাজি ধরে জাহিদের হোমওয়ার্ক ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেললি–"

"আমার বয়স তখন আট।"

হামিদ গম্ভীর মুখে বলল, "আট বছরেই মানুষের ক্যারেক্টার তৈরি হয়ে যায়। তোর সেই ক্যারেক্টারই এখনো আছে–"

মানুষের চরিত্র নিয়ে নিশ্চয়ই আরো আলোচনা হতো কিন্তু ঠিক তখন একজন হামিদকে ডেকে জানতে চাইল সস্তায় বিশ্বাসযোগ্য বাইপাস সার্জারি কে করতে পারে! হামিদ সে ব্যাপারে আলোচনা শুরু করে দেয়ায় আমি আপাতত মুক্তি পেলাম। আবিদ হাসান আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার কথা জানি না, কিন্তু হামিদ একটা ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার।"

আমি বললাম, "অথচ মজার কথা জানেন? যখন স্কুলে পড়ত তখন তার পেটে বোমা মারলেও মুখ দিয়ে কথা বের হতো না। এখন তার মাথায় বোমা মারলেও মুখ বন্ধ করা যায় না!"

আবিদ হাসান হাসি হাসি মুখ করে বলল, "আপনি কোথায় আছেন? আমি ব্যাংকে চাকরি করি।"

"আমি মাস্টার। ইউনিভার্সিটিতে পড়াই।"

এইভাবে আমার আবিদ হাসানের সাথে পরিচয় হলো, পরিচয় হবার আগে মনে হচ্ছিল মানুষটা গোমড়ামুখী, পরিচয় হবার পর দেখা গেল মানুষটা বেশ হাসি-খুশি।

চা বাগানে পৌঁছানোর পর সবাই মাইক্রোবাস থেকে হৈচৈ করে নেমে পড়ে। জায়গাটা খুব সুন্দর– গাছগাছালিতে ঢাকা কিন্তু কাউকে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে

দেখলাম না। গেস্ট হাউজের বিছানা এবং এয়ার কন্ডিশন নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে গেল। সেটা শেষ হবার পর খাবার মেনু নিয়ে তুমুল আলোচনা শুরু হয়ে গেল। আমি আবার মন খারাপ করে বাইরে একটা গাছের নিচে বসেছি তখন আবিদ হাসান আবার পাশে এসে বসল। বলল, "জায়গাটা সুন্দর!"

"হ্যাঁ।"

"সব মানুষের মাঝে মাঝে গাছগাছালির কাছে যাওয়া উচিত। নদীর কাছে যাওয়া উচিত। মেঘ-বৃষ্টির কাছে যাওয়া উচিত।"

আমি আবিদ হাসানের মুখের দিকে তাকালাম, এই কথাটা বলার জন্যে তাকে আমি পছন্দ করে ফেললাম। আমরা তখন বসে বসে গাছগাছালি নিয়ে কথা বললাম, নদী নিয়ে কথা বললাম, মেঘ আর বৃষ্টি নিয়ে কথা বললাম।

দুপুরের খাওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হলো। বিশাল ডাইনিং টেবিলের চারপাশে বসে থাকা মানুষগুলো খুব উৎসাহ নিয়ে খেল। তাদের খাওয়া দেখতে দেখতে হঠাৎ করে আমার মনে হলো মানুষের খাওয়ার প্রক্রিয়াটা আসলে কুৎসিত। দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে বলে সেটা আর আলাদা করে চোখে পড়ে না। আমাদের মুখ আসলে ভেজা এবং আঠালো একটা গর্ত, সেখানে কোনো কিছু ছিঁড়ে পিষে ফেলার জন্যে ধারালো কিছু জিনিস আছে যেটাকে আমরা বলি দাঁত এবং লালচে ভেজা ভেজা পিছলে একটা জিনিস মুখের ভেতর খাবারগুলো ওলটপালট করে, সেটাকে আমরা বলি জিব! তেলতেলে এবং ভেজা ভেজা কিছু খাবার আমরা মুখ নামের সেই গর্তে ঠেসে দিই এবং সেটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে পিষে আঠালো একটা পিণ্ড তৈরি করে গলার মাঝে ঠেলে দিই, অন্ননালি নামে একটা অন্ধকার গর্ত দিয়ে সেটা যেতে থাকে– কী ভয়ংকর!

আমার বন্ধুর বন্ধুরা খুব শখ করে খেতে লাগল এবং আমি চোখের কোনা দিয়ে তাদের খাওয়ার ভঙ্গি দেখতে লাগলাম। ভয়ংকর জিনিস দেখার মাঝেও একটা আনন্দ আছে। খেতে খেতে তারা অসুখ-বিসুখ নিয়ে কথা বলতে লাগল। ডায়াবেটিস হলে কী করতে হয়, কেন ডায়াবেটিস হয় আমি সেটা জেনে গেলাম। ব্লাড প্রেসার হলে কোন কোন খাবার খেতে হয় এবং কোন কোন খাবার খেতে হয় না আমার সেই জ্ঞানটাও হয়ে গেল। কোষ্ঠকাঠিন্য হলে তার আয়ুর্বেদী চিকিৎসা কী সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলো। চোখে ছানি পড়লে কোন ডাক্তার সবচেয়ে ভাল করে ছানি কাটতে পারে সেটা নিয়ে প্রথমে আলোচনা এবং শেষের দিকে এক ধরনের ঝগড়াঝাঁটি হয়ে গেল। আমাদের খুবই সৌভাগ্য

পাইলসের চিকিৎসা নিয়ে যখন আলোচনাটা জমে উঠেছে তখন আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে বলে টেবিল থেকে উঠে পড়তে পারলাম।

খাওয়ার পর গেস্ট হাউস থেকে বের হয়ে চা বাগানে হাঁটাহাঁটি করার কথা ছিল কিন্তু দেখা গেল আকাশ কালো করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। অসময়ের বৃষ্টি একটু অন্যরকম, আমি আগ্রহ নিয়ে বারান্দায় বসে পানির ফোঁটাগুলো দেখছি তখন শুনতে পেলাম অন্যেরা বৃষ্টির জন্য খাওয়া-দাওয়ার একটা স্পেশাল মেনু তৈরি করতে বসে গেছে!

দুপুর থেকে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সেটা আর থামল না। ঝড়ো বাতাসের সাথে সাথে সেই বৃষ্টি পড়তেই লাগল। কেউ আর গেস্ট হাউজ থেকে বের হতে পারল না। চা বাগানে বেড়াতে এসে কেউ চা বাগানটা দেখতে পেল না সে জন্যে কারো মন খারাপ হলো না। বরং গেস্ট হাউজ থেকে বের হয়ে হাঁটাহাঁটি করতে হলো না বলে সবারই মনে হলো এক ধরনের আনন্দ হলো। কয়েকজন বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে ভোঁস ভোঁস করে নাক ডেকে ঘুমাতে লাগল। অন্যেরা বসে বসে তাস খেলতে লাগল! গেস্ট হাউজে একটা টেলিভিশন আছে, সেটাতে কোনো চ্যানেল নেই, ঝিরঝির করে শুধু বিটিভি দেখা যায়, কয়েকজন খুব মনোযোগ দিয়ে সেই অনুষ্ঠান দেখতে থাকল!

রাত্রিবেলা খাবার টেবিলের আয়োজন ছিল দুপুর থেকে জমকালো– রোস্ট, বিরিয়ানি, এরকম ভয়াবহ ধরনের অস্বাস্থ্যকর খাবার। খাওয়ার সময় আলোচনাটা আবার অসুখ দিয়ে শুরু হলো, একজন তখন দুরারোগ্য একটা অসুখ কীভাবে এক পীরের দোয়ায় ভাল হয়ে গিয়েছিল সেই গল্পটা খুব উৎসাহ নিয়ে বর্ণনা করল। পুরো আলোচনাটা তখন পীর-ফকিরের দিকে ঝুঁকে পড়ল। সেখান থেকে জিন এবং জিন থেকে ভূতের মাঝে চলে এলো। দেখা গেল এখানে যারা উপস্থিত আছে তাদের সবার জীবনেই কোনো না কোনো জিন কিংবা ভূতের গল্প মজুদ আছে। গল্প শুনতে আমার ভাল লাগে তাই আমি খুব আগ্রহ নিয়ে গল্পগুলো শুনলাম– অনেক গল্পই আজগুবি এবং মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয় কিন্তু আমি সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। হার্ব হেনরিকসন নামে আমার এক আমেরিকান বন্ধু আমাকে বলেছিল সত্য কথা বলার চেষ্টা করে একটা মজার গল্প নষ্ট করা উচিত না, আমি সেটা সবসময় বিশ্বাস করে এসেছি।

গেস্ট হাউজে অনেকগুলো ছোট ছোট ঘর, একটা ঘরে দুটো করে বিছানা। আমাদের ঘরে আমি আর আবিদ হাসান– যখন কম্বল মুড়ি দিয়ে বিছানায় এসে

শুয়েছি তখন রাত দশটা। আমি আবিদ হাসানকে বললাম, "আমি শুয়ে শুয়ে একটু বই পড়ি? লাইটটা জ্বালানো থাকলে সমস্যা হবে?"

"কোনো সমস্যা হবে না।" আবিদ হাসান বলল, "ঘুমানোর সময় আমারও শুয়ে শুয়ে একটু পড়ার অভ্যাস।"

আবিদ হাসান তার ব্যাগ থেকে একটা মোটা বই বের করতে করতে বলল, "ডাইনিং টেবিলে ভূতের গল্প কেমন শুনলেন?"

"ভাল। তবে গল্পের লজিকে অনেক সমস্যা আছে!"

আবিদ হাসান হাসার ভঙ্গি করে বলল, "ভূতের গল্পে লজিক খোঁজার চেষ্টা করে লাভ নেই। যদি লজিক থাকত তাহলে সেটা কী আর ভূতের গল্প হতো?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "তা ঠিক।"

আবিদ হাসান তার ব্যাগ থেকে মোটা বইটা বের করে বিছানায় আধশোয়া হয়ে বলল, "আমরা বাঙালিরা খুব কথা বলতে পছন্দ করি, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি দেখেছেন, যখন ভূতের গল্প শুরু হলো তখন সবাই কিছু না কিছু বলেছে! আমি আর আপনি ছাড়া।"

আমি বললাম, "আমার কথা আলাদা। আমি কথা বলা থেকে কথা শুনতে বেশি পছন্দ করি। আপনি?

আবিদ হাসান হাসতে হাসতে বলল, "আমার বলতেই বেশি ভাল লাগে।"

"তাহলে বললেন না কেন? ভূতের সাথে কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই?"

আবিদ হাসান কিছু না বলে চুপ করে রইল। আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "হয়েছে?"

"আসলে এটাকে ভূত বলব না কী বলব বুঝতে পারছি না– কিন্তু হয়েছে।"

আমি বিছানায় সোজা হয়ে বসে বললাম, "হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"কী হয়েছে?"

"আপনি শুনতে চাইলে বলতে পারি কিন্তু আমি সাধারণত কাউকে বলি না।"

"কেন বলেন না?"

"এমন অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা যে কেউ বিশ্বাস করতে চায় না! সবাই ভাবে আমি গুলপট্টি মারছি!"

ভাল একটা গল্পের ইঙ্গিত পেয়ে আমি বালিশ ঠেস দিয়ে আরাম করে বসে বললাম, "শুনি আপনার গুলপট্টি! বলেন!"

আবিদ হাসান আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "সত্যি শুনবেন?"

"হ্যাঁ। বলেন।"

"বিশ্বাস না করতে চাইলে বিশ্বাস করবেন না– আমি আপনাকে জোর করব না। তবে জেনে রাখেন আমি কিন্তু একটা কথাও মিথ্যা বলব না।"

"ঠিক আছে।"

"শুনেন তাহলে।" আবিদ হাসান তখন তার গল্প শুরু করল। তার নিজের ভাষায় গল্পটা এরকম :

আমি যখন ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে বের হয়েছি তখন একটা চাকরির খুব দরকার, মধ্যবিত্তের ছেলে, বাবা-মা কষ্ট করে লেখাপড়া করিয়েছে, একটা চাকরি না পেলে কেমন করে হয়? এমনিতেই চার বছরের ডিগ্রি শেষ হতে ছয় বছর লেগেছে, এখন পাস করে তো আর বাবার হোটেলে খেতে পারি না। ক্লাসের স্মার্ট ছেলেমেয়েগুলো তাদের মামা-চাচাদের জোরে ঝটপট চাকরি পেয়ে গেল, আমি তো আর চাকরি পাই না। অনেক কষ্টে একটা এন.জি.ও.তে চাকরি পেলাম। বেতন কম, সুযোগ-সুবিধেও নেই। সবচেয়ে বড় কথা পোস্টিং হলো যমুনা নদীর চরাঞ্চলে। ছুটিছাঁটা নেই, তবুও আমি চাকরিটা নিয়ে নিলাম।

যথাসময়ে কাজে যোগ দিয়েছি, বাস-নৌকা করে অনেক কষ্টে পৌঁছেছি। গ্রামের ভেতরে ছোট খুপরির মতো একটা বাসা, সেখানে আমাদের এন.জি.ও.য়ের একট সাইনবোর্ড লাগানো। আমি ছাড়া সেখানে আরও একজন চালবাজ ধরনের মানুষ থাকে, তার নাম মফিজ। আমাদের রান্নাবান্না করে দেবার জন্যে দেখাশোনা করার জন্য একটা ছেলে থাকে, তার নাম কাদের।

প্রথম দিনেই মফিজ আমাকে জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করল, জিজ্ঞেস করল, "আগে কখনো গ্রামে ছিলে?"

"না।"

"খুব সাবধান। গ্রাম হচ্ছে ডেঞ্জারাস জায়গা।"

"কেন?"

"কয়দিন থাকো তাহলে নিজেই বুঝতে পারবে। গ্রামের মানুষদের দেখলে মনে হয় তারা বোকাসোকা, কিছু বুঝে না। কিন্তু তারা অসম্ভব ধুরন্ধর। তোমাকে দশ বার বিক্রি করে দেবে।"

আমি শুকনো মুখে বললাম, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। চেষ্টা করবে তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখতে–"

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "কিন্তু আমাকে ট্রেনিং দিয়ে বলেছে তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে। তারা যদি আমাকে বিশ্বাস না করে আমি তাদের কাছ থেকে কোনো খবর পাব না।"

মফিজ হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বলল, "ঐ রকম বড় বড় কথা সবাই বলে–"

"কিন্তু আমাদের ডাটা নিতে হবে, কতজন মানসিক প্রতিবন্ধী আছে খুঁজে বের করতে হবে। কী রকম সমস্যা সেটা ক্লাসিফাই করতে হবে–"

মফিজ হা হা করে হেসে বলল, "সেগুলো করার জন্য এই প্যাক-কাদার মাঝে ঘুরতে হবে কে বলেছে? কাগজ নাই? কলম নাই? মাথার মাঝে বুদ্ধি নাই?"

আমি আমতা আমতা করে বললাম, "তার মানে বানিয়ে বানিয়ে লিখব?"

মফিজ টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "অবশ্যই! সবাই বানিয়ে বানিয়ে ডাটা তৈরি করে! যারা তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে তারাও জানে তুমি বানিয়ে বানিয়ে ডাটা তৈরি করবে।"

"কী বলছেন আপনি?"

"সত্যি কথা বলছি! যদি তাদের সত্যি ডাটার দরকার হতো তাহলে তারা সত্যিকারের বেতন দিত। তোমাকে কয় পয়সা বেতন দেয়?"

বেতনের কথাটা সত্যি কিন্তু তাই বলে ঘরে বসে ডাটা তৈরি করে হেড অফিসে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেব সেটা কেমন করে হয়? আমি খানিকটা দুশ্চিন্তার মাঝে পড়ে গেলাম।

যদিও মফিজ বলে দিয়েছে গ্রামের মানুষের সাথে সম্পর্ক না রাখতে তবুও কয়েকদিনের মাঝেই আমি তাদের সাথে একটা সম্পর্ক করে ফেললাম। কিছুদিনের মাঝে আমি আবিষ্কার করলাম গ্রামের মানুষের মাঝে যে দুই-চারজন ধুরন্ধর ধরনের মানুষ নেই তা নয় কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ আসলে সহজ-সরল। তাদের সাথে আমার এক ধরনের খাতির হয়ে গেল। দুই বছর থাকার পরও মফিজের বেলায় যেটা হয় নি, আমার বেলায় সেটা দুই সপ্তাহের মাঝে হতে শুরু করল। গ্রামের বিয়ে শাদিতে আমি দাওয়াত পেতে শুরু করলাম, তাদের কোনো ঝামেলা হলেও তারা পরামর্শের জন্যে আমার কাছে আসতে শুরু করল। আমার কাজকর্ম দেখে মফিজ খুব বিরক্ত হলো!

একদিন গ্রামের এক মাতব্বরের মেয়ের বিয়ে, আমাকে দাওয়াত দিয়েছে, সময়ের খুব টানাটানি তবু গিয়েছি। বাইরে শামিয়ানা টানিয়ে বসার জায়গা করা

হয়েছে। আমরা সেখানে বসে আছি এরকম সময় হঠাৎ করে শুনি হৈচৈ, লোকজন ছোটাছুটি করতে লাগল। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

"মড়া এসেছে। মড়া।"

"মড়া কে?"

"জিন্দা লাশ!"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "জিন্দা লাশ আবার কী?"

"মড়া যখন মরে যায় তখন লাশ হয়ে যায়, তারপর আবার বেঁচে ওঠে। খুব ভয়ের ব্যাপার।"

মানুষগুলোর কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, তাই আমি নিজেই দেখতে গেলাম। বাড়ির বাইরে দূরে একটা গাছের নিচে মানুষের ভিড়। আমি ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে "মড়া" নামের মানুষটাকে দেখতে পেলাম। ছোটখাটো একজন মানুষ, বয়স কত বোঝা যায় না, রোদে পোড়া চামড়া। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কাঁচাপাকা চুল, হলুদ ময়লা দাঁত। গায়ে ময়লা ছেঁড়া কাপড়। মানুষটা উবু হয়ে বসে একটা সিগারেট খাচ্ছে। মানুষটার সাথে আমার চোখাচোখি না হওয়া পর্যন্ত আমি ধরে নিয়েছিলাম মড়া হচ্ছে এই গ্রামের ভবঘুরে পাগল মানুষটি। সব গ্রামেই এরকম একজন দুইজন থাকে– মড়া হচ্ছে এই গ্রামের সেরকম একজন মানুষ। কিন্তু গাছের নিচে চুপচাপ বসে সিগারেট খেতে খেতে একসময় মড়া চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। তার সাথে চোখাচোখি হওয়া মাত্রই এক ধরনের আতংকে আমার সারা শরীর শিউরে উঠল। চোখ দুটোর মাঝে কী আছে আমি জানি না কিন্তু মনে হলো তার দৃষ্টি আমাকে ভেদ করে চলে গেছে। চোখ দুটো ভাবলেশহীন এবং মৃত মানুষের মতো শীতল। যখন আমার দিকে তাকাল তখন মনে হলো সে বুঝি আমার ভেতরের সবকিছু জেনে ফেলেছে। আমি নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কে?"

একজন বলল, "এই স্যার নূতন আসছেন। তোরে চিনেন না। তুই পরিচয় দে।"

মড়া আমার দিকে তাকিয়ে তার ময়লা দাঁত বের করে হেসে বলল, "আমি মড়া।"

"তোমাকে দেখে তো মোটেও মড়া মনে হচ্ছে না। তুমি তো বেশ বেঁচেই আছ।"

"জে। আমি বেঁচেই আছি!"

"তাহলে তোমাকে মড়া ডাকে কেন?"

মড়া আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন বলল, "মড়া মাঝে মাঝে মরে যায়। সেই জন্যে তার নাম মড়া।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "তুমি মরে যাও?"

মড়া কথার উত্তর না দিয়ে তার ময়লা দাঁত বের করে হাসার ভঙ্গি করল। ছোট বাচ্চারা অর্থহীন প্রশ্ন করলে বড়রা যেরকম তার দিকে তাকিয়ে হাসে অনেকটা সেরকম। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি মরে একটু দেখাতে পারবে?"

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "না স্যার, না! ওটা দেখতে চাবেন না। খুব বিপদ হয়।"

"বিপদ?"

"জি স্যার। খুব বিপদ।" তারপর আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, "মড়া খুব ভয়ংকর মানুষ। আসলে মানুষ না। আসলে পিচাশ।"

এরকম সময় দেখতে পেলাম থালায় করে একজন খাবার আনছে। তার পিছনে পিছনে একজন মুরুব্বি শংকিত মুখে আসছেন। মড়ার সামনে খাবার রাখার পর সে খাবারটা এক নজর দেখে মুরুব্বির দিকে তাকাল। মুরুব্বি বললেন, "এটা তোর কেমন কাজ হলো? আজ আমার মেয়ের বিয়ে আর তুই এইখানে?"

মড়া তার ময়লা হলুদ দাঁত বের করে বলল, "অনেকদিন ভাল-মন্দ খাই না। পেটে ভুখ লেগেছে।"

"খেয়ে চলে যাবি। এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাবি।"

"জে যাব।"

"খবরদার আর আসবি না।"

"আসব না।"

"তাড়াতাড়ি খা। খেয়েই চলে যা।"

মড়া মাথা নেড়ে তার হলুদ দাঁত বের করে হাসল, অপ্রকৃতস্থ ভয়ংকর এক ধরনের হাসি। যদিও মুরুব্বি ধমকের সুরে মড়ার সাথে কথা বলছেন কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মানুষটি মড়াকে ভয় পায়।

মড়া খাবার প্লেটটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "এক খিলি পান আর দুইটা সিগারেট মিয়া ভাই। ভাল-মন্দ খেলে জর্দা দিয়ে পান খাবার ইচ্ছা করে।"

মুরুব্বি তাড়াহুড়া করে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ পাঠাচ্ছি। তুই তাড়াতাড়ি খা। খেয়েই বিদায় হ।"

"আর পঞ্চাশটা টাকা।"

"টাকা? টাকা কেন? তুই টাকা দিয়ে কী করবি?"

"কিছু জিনিসপাতি কিনতে হবে। দরকার আছে মিয়াভাই।"

"ঠিক আছে।"

"একটা পুরান শার্ট থাকলে দিয়েন।"

মুরব্বি অধৈর্য হয়ে বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন তাড়াতাড়ি খা। খেয়ে যা।"

আমি মানুষটাকে ভাল করে লক্ষ করলাম। সে সময় নিয়ে বেশ তৃপ্তি করে খেলো। জর্দা দিয়ে পানের খিলিটা মুখে দিয়ে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে উঠে দাঁড়াল। পুরানো যে শার্টটা দেয়া হয়েছে সেটা ঘাড়ে ফেলে সে চলে যেতে শুরু করে। বাম পা'টা টেনে টেনে হাঁটছে। সড়কটার উপরে ওঠার সাথে সাথে ক্ষেতে বেঁধে রাখা একটা বড় ষাঁড় দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে উল্টো দিকে ছুটে যেতে শুরু করে। দেখে মনে হয় পশুটা কোনো কিছু দেখে ভয় পেয়েছে। মড়ার পিছু পিছু কিছু কৌতূহলী শিশু আর মানুষ খানিকটা দূরত্ব রেখে হাঁটতে থাকে। সেখান থেকে কেউ একজন মনে হয় মড়াকে কিছু বলল, কারণ হঠাৎ মড়া থেমে গিয়ে পিছনে ঘুরে তাকাল, সাথে সাথে সবাই ছুটে পালাতে শুরু করে। মড়া নামের এই চরিত্রটি কী আমি এখনো জানি না, কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি, মানুষ আর পশু সবাই তাকে ভয় পায়।

খানিকক্ষণ পর সবাই খেতে বসেছে, হঠাৎ একটু উত্তেজিত কথাবার্তা শুনতে পেলাম, আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

আমার পাশে বসে থাকা মানুষটা বলল, "মজিদ মিয়ার ছেলে, রক্ত বমি করছে।"

"রক্ত বমি? সর্বনাশ! কেন?"

"মড়ারে নাকি গালি দিয়েছিল। মড়ার দৃষ্টি লেগেছে।"

দৃষ্টি লাগা কী জিনিস আমি জানি না, সেটা কেমন করে লাগে তাও জানি না। তাই তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে আমি উঠে গিয়েছি দেখতে। বারান্দায় তেরো-চৌদ্দ বছরের একটা ছেলে শুয়ে থরথর করে কাঁপছে। আমি থাকতে থাকতেই মাথা তুলে বমি করল, রক্ত বমি নয় সাধারণ বমি! মাথার কাছে একজন মহিলা বসে বিলাপ করছে। আমি বললাম, "এত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে? শরীর খারাপ হয়েছে আবার ভাল হয়ে যাবে।"

"মড়ার কু-দৃষ্টি লেগেছে গো বাবা—"

আমি হাত দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে বললাম, "ধুর! কু-দৃষ্টি আবার কী! বেশি বমি করলে স্যালাইন তৈরি করে খাইয়ে দিও। যদি বেশি শরীর খারাপ হয় সদরে নিয়ে যেও। এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? মানুষের অসুখ-বিসুখ হয় না?"

আমার কথায় কাজ হলো। এটা কোনো কু-দৃষ্টি নয়, সাধারণ শরীর খারাপ ব্যাপারটা মেনে নেয়ার সাথে সাথে দেখলাম ছেলেটা মোটামুটি সাহস পেয়ে উঠে বসল। এদিক-সেদিক ইতিউতি তাকাতে লাগল।

রাত্রে আমি মফিজের সাথে মড়ার কথা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমার কথা শুনেই সে মাথা নেড়ে বলল, "যত সব ভড়ং। গ্রামের মানুষ হচ্ছে কুসংস্কারের বান্ডিল! এদের পিছনে বেত দিয়ে চাবকানো দরকার।"

মফিজের কথা একেবারে একশ ভাগ সত্যি! গ্রামের মানুষের আসলেই হাজার রকমের কুসংস্কার! তবে পিছনে চাবুক দিয়ে এই কুসংস্কার দূর করা যাবে আমি সে ব্যাপারে খুব নিশ্চিত নই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সবাই মড়াকে এত ভয় পায় কেন?"

"আমাকে জিজ্ঞেস করো না। তুমি একটু ভুচুং ভাচুং করো দেখবে তোমাকেও ভয় পাবে।"

"শুধু কী ভুচুং ভাচুং? আপনি ওর চোখের দৃষ্টি দেখেছেন?"

"কী আছে চোখের দৃষ্টিতে?"

"আমি জানি না কিন্তু যখন আমার দিকে তাকাল আমার কেমন জানি ভয় লেগে গেল।"

মফিজ হা হা করে হেসে বলল, "এখন বুঝেছ তো মানুষ কেন মড়াকে ভয় পায়? তোমার মতো মানুষ যদি মড়াকে দেখে ভয় পায় তাহলে গ্রামের এই কুসংস্কারের ডিব্বারা কেন ভয় পাবে না?"

"মানুষটা সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?"

"না। সেরকম কিছু জানি না। নদীর পাড়ে একটা জংলামতন জায়গা আছে, সেখানে একটা ভাঙা মন্দিরের মতন আছে, সেইখানে থাকে। দিনের বেলা সাধারণত বের হয় না। রাত্রে বের হয়।"

"বের হয়ে কী করে?"

"আমি কেমন করে বলব? গ্রামের মানুষের ধারণা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাচ্চাদের রক্ত শুষে খায়। মডার্ন ড্রাকুলা আর কী!"

আমি পরের কয়েকদিন মড়ার খোঁজখবর নিলাম। সে এই গ্রামেই থাকে কিন্তু

বেশিরভাগ মানুষ তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। গ্রামের মানুষের বিশ্বাস মড়া পিচাশ সিদ্ধ। তার অলৌকিক শক্তি আছে– চোখের দিকে তাকিয়ে সে মানুষের রক্ত শুষে খেয়ে ফেলতে পারে!

মফিজ যদিও বলেছিল যে একটা কাগজ আর কলম নিয়ে বসে বুদ্ধি খাটিয়ে গ্রামের প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কিছু ডাটা তৈরি করে ফেলতে কিন্তু আমি সেদিক দিয়ে গেলাম না। গ্রামের মানুষজনের সাথে পরিচয় হয়েছে, তাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রতিবন্ধীদের তালিকা করতে লাগলাম। কাজে লাগার পর আমি আবার নূতন করে আবিষ্কার করলাম কী ধরনের ভয়ংকর কুসংস্কারে মানুষগুলো ডুবে আছে। বলা যেতে পারে এমন একটা বাড়িও খুঁজে পেলাম না যেখানে বউ-ঝি কিংবা মেয়েদের কাউকে না কাউকে ভূত-জিনে ধরে নি। কিংবা ধরবে ধরবে করছে না।

তালিকা করতে করতে একদিন মনে হলো এই তালিকায় নিশ্চয়ই মড়ার নামও থাকা উচিত! যে কোনো হিসেবেই সে নিশ্চয়ই অপ্রকৃতস্থ। তাই একদিন খুঁজে খুঁজে আমি নদীর তীরে একটা জংলা জায়গায় ভাঙা একটা মন্দিরের সামনে হাজির হলাম। যে আমাকে নিয়ে এসেছিল সে বহুদূর থেকে মন্দিরটা আমাকে দেখিয়েই পালিয়ে গেল।

আমি মন্দিরের কাছাকাছি যেতেই ভেতর থেকে একটা চাপা হিংস্র গর্জন শুনতে পেলাম। আমি আর ভিতরে ঢুকলাম না, ভয় পাওয়া গলায় মন্দিরের বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, "কেউ আছে ভিতরে?"

আমি আবার ভেতরে চাপা গর্জন শুনতে পেলাম, এবারে মনে হলো গর্জনটা কুকুরের। কেউ একজন কুকুরটাকে শান্ত করার জন্যে চুক চুক করে জিব দিয়ে শব্দ করল, তারপর জিজ্ঞেস করল, "কেডা?"

"আমি।"

"ও! আসেন।"

আমি একটু অবাক হলাম, কথা শুনে মনে হচ্ছে আমার কথা শুনেই সে আমাকে চিনে ফেলেছে। আমি একটু সাহস করে মন্দিরের ভাঙা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছি। ভিতরে অন্ধকার, চোখ সয়ে যেতে একটু সময় লাগল। চোখ সয়ে যাবার পর দেখলাম ঘরের এক কোনায় গুটিশুটি মেরে মড়া বসে আছে। একেবারে তার গা ঘেঁষে একটা বিশাল কুকুর বসে আছে, কুচকুচে কালো এবং হিংস্র চেহারার, দেখে মনে হয় ইচ্ছে করলে এক কামড়ে আমার টুঁটি ছিঁড়ে

ফেলতে পারে। আগে যদি জানতাম এইখানে এত বড় কুকুর আছে আমি কখনোই ঢোকার সাহস পেতাম না।

কুকুরটা তার গলার ভেতর থেকে গররর ধরনের একটা ভারী আওয়াজ করছে। মড়া হাত দিয়ে কুকুরটার গলা ধরে রেখেছে বলে কুকুরটা লাফিয়ে পড়ছে না। যদি তার হাতটা একটু সরায় মনে হয় তাহলেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি আড়চোখে কুকুরটার দিকে এক নজর দেখে মড়ার দিকে তাকালাম। নোংরা ঘরে নানা ধরনের জঞ্জাল ছড়ানো, তার ভেতরে সে গুটিশুটি মেরে বসে আছে। ঘরের ভেতরে এক ধরনের বোটকা গন্ধ, ঘরের মাঝামাঝি কোথাও একটা মাটির মালসায় তুষের আগুন জ্বলছে। ভেতরে ভ্যাপসা এক ধরনের গরম। মড়া আমার দিকে এক নজর তাকিয়ে চোখ নামিয়ে বলল, "আমার বাড়িতে কুনোদিন কুনো অতিথি আসে নাই। আপনি প্রথম।"

আমি গলায় জোর করে একটা আলগা অন্তরঙ্গতার ভাব ফুটিয়ে বললাম, "সবাই তোমারে ভয় পায়। আসার সাহস নাই। আর তোমার যে বড় কুকুর দেখলেই ভয় লাগে।"

মড়া তার কুকুরটাকে আদর করে, জড়িয়ে ধরে বলল, "কুনো ভয় নাই। বাঘা আমার পরিবার। আমার সন্তান। আমি আর বাঘা সবসময় একসাথে থাকি।"

"নামটা ঠিকই দিয়েছ। দেখতে-শুনতে বাঘের মতোই।"

"তয় মনটা খুব নরম।" বলে মড়া তার কুকুরটাকে আদর করল, কুকুরটা গলার ভেতর থেকে এক ধরনের শব্দ বের করে সেই আদরটা গ্রহণ করল বলে মনে হলো।

আমি ঠিক কীভাবে কথা শুরু করব বুঝতে পারছিলাম না, তাই ইতস্তত করে বললাম, "আমি তোমার সাথে একটু কথা বলতে পারি?"

"আমার সাথে কী নিয়ে কথা বলবেন? আমি অশিক্ষিত মূর্খ মানুষ। পাগল ছাগল অপয়া মানুষ! আমার সাথে কারো কুনো কথা নাই–"

"আছে। তুমি যদি রাজি থাকো তাহলেই আছে।"

"বলেন। কথা বলেন। আমার সাথে আগে কেউ কুনো কথা বলে নাই।"

আমি একটু ফাঁকা জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়লাম, বাঘা নামের কুকুরটা একটা হিংস্র গর্জন করে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল কিন্তু মড়া তাকে ধরে রাখল বলে উঠতে পারল না। আমি জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে বললাম, "তোমাকে সবাই মড়া ডাকে। কিন্তু মড়া তো কারো নাম হতে পারে না। তোমার নিশ্চয়ই অন্য নাম আছে!"

মড়া মাথা নাড়ল, বলল, "নাই। সারা জীবন আমার এই একটাই নাম। মড়া।"

"কিন্তু তোমার বাবা-মা কী তোমাকে মড়া ডাকত?"

"আমার বাবা-মা নাই। কুনোদিন দেখি নাই।"

"তোমাকে সবাই এত ভয় পায় কেন?"

"সেইটা তো জানি না।"

আমি বললাম, "সবাই বলে তোমার নাকি কু-দৃষ্টি আছে।"

মড়া কোনো কথা না বলে মাটির দিকে তাকাল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "আছে?"

"আমি জানি না। আমি কুনোদিন কাউরে কু-দৃষ্টি দেই নাই।"

"তাহলে তোমার দৃষ্টি দিয়ে মানুষজন রক্ত বমি করে কেন?"

"আমি জানি না। আমি কাউরে কু-দৃষ্টি দেই না।"

"মানুষ তোমারে ভয় পায় সেইটা তুমি জানো?"

"জানি।"

"কেন?"

মড়া মাথা নাড়ল, "আমি জানি না।"

"তোমার কী কোনোরকম ক্ষমতা আছে?"

মড়া কোনো কথা না বলে চুপ করে বসে রইল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "আছে কোনো ক্ষমতা?"

মড়া এবারেও কোনো কথা বলল না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "আছে?"

মড়া এবারে কেমন যেন অসহিষ্ণু গলায় বলল, "আপনি এইসব কী জিজ্ঞেস করেন?"

কালো রঙের ভয়াবহ কুকুরটাও মড়ার গলার অসহিষ্ণু সুরটা ধরে ফেলে চাপা গলায় গররর করে উঠল। আমি বুঝতে পারলাম এখন আমার ওঠার সময় হয়েছে।

আমি যখন উঠে বিদায় নিয়ে বের হয়ে এসেছি মড়া আমার দিকে ঘুরেও তাকাল না। কোনো কারণে সে হঠাৎ করে আমার উপর খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

গ্রামের প্রতিবন্ধী মানুষের তালিকার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি। গরিব মানুষজনেরা তাদের সমস্যার কথা বলতে সংকোচ করে না। কিন্তু মোটামুটি

অবস্থাপন্ন মানুষদের কথা আলাদা। তারা নিজেদের সমস্যার কথা বলতে চায় না। গ্রামের মানুষের কাছে কথা বলে জানতে পারলাম গ্রামের চেয়ারম্যান কাজেম আলীর একটা মেয়ে নাকি প্রতিবন্ধী, তবে তাকে কেউ দেখে না। মেয়েটাকে নিশ্চয়ই বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে রাখে, তবু আমার মনে হলো একদিন তার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিই। রাত্রে মফিজের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে একটু কথা বলতেই সে হা হা করে উঠল, বলল, "তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"কাজেম আলীকে তুমি দেখো নাই?"

"দেখেছি। কেন?"

"তোমার সাহস তো কম না, তুমি তার বাড়িতে গিয়ে তার মেয়ের খোঁজ নেবে!"

"কী হবে খোঁজ নিলে?"

"তাহলে এই গ্রামে তোমার আর থাকতে হবে না! এই কাজেম আলী অনেক ডেঞ্জারাস। নূতন চর উঠলেই সে তিন-চারটা করে মার্ডার করে। তুমি যদি তাকে বেইজ্জতি করো তাহলে তোমাকেও মার্ডার করে চরের মাঝে মেরে পুঁতে রাখবে!"

"আমি তাকে বেইজ্জতি করলাম কখন?"

"তার মেয়ে প্রতিবন্ধী বললে তার বেইজ্জতি হয় না?"

আমি মাথা নাড়লাম, একটু চিন্তা করে বললাম, "ঠিকই বলেছেন।"

তারপরেও আমি একদিন কাজেম আলীর বাসায় হাজির হলাম। তার মেয়ে সম্পর্কে তথ্য নেওয়া থেকে আমার বেশি আগ্রহ কাজেম আলী মানুষটাকেই একটু কাছ থেকে দেখা। যেই মানুষ মুখের কথায় দুই-চারটা মার্ডার করে ফেলতে পারে সে কীভাবে কথা বলে, তাকায়, হাঁটা-চলা করে সেটা জানার একটু কৌতূহল।

আমি খোঁজখবর নিয়ে গিয়েছি, কাজেম আলীর কাছে খবর পাঠানোর সাথে সাথেই আমাকে ভিতরে ডেকে নেয়া হলো। উঠানের মাঝামাঝি একটা জলচৌকিতে কাজেম আলী খালি গায়ে বসে আছে। লুঙ্গিটা হাঁটুর উপর তুলে রাখা এবং একজন মানুষ তার শরীরে তেল মাখিয়ে দিচ্ছে– দৃশ্যটি অত্যন্ত কুৎসিত! কাজেম আলী হুংকার দিয়ে বলল, "একটা চেয়ার দিয়ে যা।"

প্রায় সাথে সাথেই একজন মানুষ একটা চেয়ার দিয়ে গেল। আমি চেয়ারটাতে বসলাম, কাজেম আলী ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার জন্য কী করতে পারি?"

"আমি নূতন এসেছি! আমাদের অর্গানাইজেশন থেকে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে এই গ্রামের মানসিক প্রতিবন্ধীর একটা তালিকা করতে।"

কাজেম আলীর মুখটা হঠাৎ পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল– আমার দিকে লাল চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে আমার কাছে আসছেন কেন?"

"আপনি চেয়ারম্যান। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি আমি কোথায় যাব। কাকে জিজ্ঞেস করব।"

কাজেম আলী কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, "এইখান থেকে শুরু করতে পারেন।"

"এইখান থেকে?"

"হ্যাঁ।"

"মানে?" আমি সত্যিই কাজেম আলীর কথা বুঝতে পারছিলাম না– "এইখান থেকে কী শুরু করব?"

"লিস্টি। এই গ্রামের লিস্টি এই বাড়ি থেকে শুরু করেন। আমার একটা মেয়ে প্রতিবন্ধী।"

আমি ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলাম। ইতস্তত করে বললাম, "না মানে ইয়ে আমি বুঝতে পারি নাই–"

কাজেম আলী মেঘ স্বরে বলল, "আপনি ঠিকই খবর নিয়ে আসছেন। আমি তো আর বার্লি খেয়ে বড় হই নাই। খাতা বার করেন, আমার মেয়ের নাম লেখেন।"

আমি বললাম, "না, মানে–"

কাজেম আলী ধমক দিয়ে বলল, "বার করেন আপনার খাতা– লেখেন–"

আমি বললাম, "আমি তো খাতা আনি নাই। আমি এসেছি আপনার সাথে পরিচয় করার জন্য–"

"আমি জানি আপনি কেন এসেছেন।"

আমি একটু বিপদে পড়ে গেলাম। কী বলব বুঝতে পারছিলাম না, তখন কাজেম আলী ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়ে বলল, "কে আছ? জাহানারারে পাঠাও।"

কিছুক্ষণের মাঝেই জাহানারা নামের তিন-চার বছরের মেয়েটাকে কেউ একজন হাত ধরে পৌঁছে দিয়ে গেল। মেয়েটার ভাবলেশহীন চেহারা, টানা টানা ছোট ছোট চোখ, মঙ্গোলিয়ান চেহারা। তাকে যেখানে দাঁড়া করিয়ে দেওয়া হলো

সেখানেই শূন্য দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইল। তার চারপাশে আর কিছু হচ্ছে কী-না মনে হলো সে সম্পর্কে মেয়েটা কিছুই জানে না।

কাজেম আলী আমার দিকে চোখ লাল করে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমার এই মেয়ে এরকম হয়েছে কেন জানেন?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "না জানি না।"

"আমার বউ যখন তিন মাসের পোয়াতি তখন একদিন তার মায়ের বাড়ি যাচ্ছিল। রাস্তায় দেখা হয়েছে মড়ার সাথে! মড়ারে চিনেন?"

আমি মাথা নাড়লাম, "চিনি।"

"সেই পিশাচের বাচ্চা পিশাচ আমার বউয়ের দিকে নজর দিছে। বাড়িতে এসেই বউয়ের রক্ত বমি। দুই মাস বিছানায়। যখন মেয়ের জন্ম হয়েছে সেই মেয়ে হাসে না কান্দে না। যখন বড় হইছে কথা বলে না। আপনারা বলেন প্রতিবন্ধী। আমরা গ্রাম্য ভাষায় বলি পাগল। আমার বংশে আগে-পিছে কোনো পাগল নাই। এই পিশাচের বাচ্চা পিশাচ মড়ার কারণে আমার মেয়ে আজ পাগলি।" কাজেম আলী হুংকার দিয়ে বলল, "আমি কী মড়াকে ছেড়ে দেব ভাবছেন? ছাড়ব না। তারে আমি এমন শিক্ষা দিব যেন এই হারামজাদা আর কোনোদিন কাউরে কু-দৃষ্টি দিতে সাহস না পায়।"

আমি জাহানারা নামে ছোট মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার ছোট ছোট টানা চোখ, মঙ্গলয়েডের মতো চেহারা। আমাকে যখন ট্রেনিং দিয়েছে তখন নানা ধরনের প্রতিবন্ধীদের কেমন করে চেনা যায় সেটা শিখিয়েছিল, এই প্রতিবন্ধীদের নাম ডাউন সিনড্রোম। ক্রমোজমের সংখ্যা নিয়ে সমস্যা হলে এরকম বাচ্চার জন্ম হয়। কারো কু-দৃষ্টিতে এটা হওয়া সম্ভব না। আমি ব্যাপারটা বলব কী-না ভাবছিলাম, তার আগেই কাজেম আলী গর্জন করে উঠল, "এই পিশাচের বাচ্চা পিশাচের কারণে আমার এত বড় অপমান। এখন বিদেশি মানুষ এসে আমার পাগলি মেয়ের খোঁজ নেয়। এই মেয়েরে আমি গলা টিপে মারব।" কাজেম আলী হুংকার দিয়ে বলল, "গলা টিপে মারব। তারপর খেজুরের কাঁটা দিয়া আমি মড়ার চোখ দুটি তুলে নেব যেন সেই শুয়োরের বাচ্চা আর কাউরে কু-দৃষ্টি দিতে না পারে। আর কারো সংসারে সর্বনাশ করতে না পারে।"

কাজেম আলী পা দাপিয়ে বুকে থাবা দিয়ে চিৎকার করতে লাগল। আমি কী বলব কী করব বুঝতে না পেরে হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইলাম। মফিজের কথা না শুনে আমি এখানে এসে যে কী বিপদে পড়েছি এই প্রথম আমি সেটা টের পেলাম।

চাকরি নিয়ে এই গ্রামে চলে আসার পর অনেক দিন বাসায় যাই নি, এরকম সময় শুক্র-শনিবার দুই ছুটির দিনের সাথে আশুরার ছুটি মিলিয়ে আমি প্রায় চারদিনের ছুটি পেয়ে গেলাম। আমি ভাবলাম বাসা থেকে ঘুরে আসি। অনেকদিন আগের কথা, তখন দেশে টেলিফোন বলতে ছিল না, বাসার কারো সাথে কথাও বলি না বহুদিন।

যাই হোক বাসায় চারদিন কাটিয়ে আবার সেই গ্রামে ফিরে এসেছি। মফিজ তার জন্যে কয়েকটা ম্যাগাজিনের নাম লিখে দিয়েছিল, রাত্রিবেলা ব্যাগ খুলে সেগুলো বের করে দিচ্ছি তখন সে বলল, "তোমার মড়ার তো খুব বিপদ!"

আমি বললাম, "মড়া মোটেও আমার মড়া নয়। কিন্তু বিপদটা কী?"

"কাজেম আলীর ছোট ছেলে মাঠে খেলছিল এরকম সময় মড়া যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। মড়ারে দেখে ভয় পেয়েছে– এক দৌড় দিয়েছে বাড়ির দিকে। আছাড় খেয়ে মাথা গেছে ফেটে! সদর হাসপাতালে নিয়ে তিনটা সেলাই দিতে হয়েছে!"

"কিন্তু মড়ার বিপদটা কী?"

"এইটাই তো বিপদ। রাত্রে ছেলের আকাশ-পাতাল জ্বর! সারারাত ভুল বকেছে– কাজেম আলীর কথা তো জানোই। ছেলের এই অবস্থা দেখে পারলে তখন তখনই মড়ারে কাঁচা খেয়ে ফেলে! কালকে তার বিচার!" মফিজ তার ম্যাগাজিনগুলো চোখ বুলাতে বুলাতে বলল, "তাই বলছিলাম, মড়ার খুব বড় বিপদ!"

আমি বললাম, "সবাই তো মড়াকে এত ভয় পায়। তার বিচার করবে কেমন করে? মড়া কারো দিকে তাকালেই তো তার হার্টফেল করে যাবে।"

"অন্যরা পারত না। কাজেম আলী পারবে। কাজেম আলী তো ডাকাত টাইপের, ভয়ডর কম।"

পরদিন বিকালে আমি সালিশ বিচারে গিয়ে হাজির হলাম। ভেবেছিলাম সালিশ বিচারে নিশ্চয়ই মড়া থাকবে না কিন্তু গিয়ে দেখি সেও আছে। তাকে নিশ্চয়ই জোর করে ধরে আনা হয়েছে, তার হাত এবং চোখ বাঁধা। হাতগুলো বাঁধা হয়েছে নাইলনের দড়ি দিয়ে, চোখ বেঁধেছে একটা কালো কাপড় দিয়ে। আমি এর আগে কখনো কাউকে চোখ বাঁধা অবস্থায় দেখি নি। একজন মানুষের চোখ বেঁধে রাখলে তাকে খুব অসহায় দেখায়।

সালিশে অনেক মানুষ এসেছে– তবে সবাই পুরুষ মানুষ। আমাদের গ্রামে

জরুরি কোনো ব্যাপারে কখনো মহিলাদের কোনো সুযোগ দেওয়া হয় না। কিছু চেয়ার রাখা হয়েছে, সেটাকে ঘিরে কিছু বেঞ্চ। সামাজিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে কেউ চেয়ারে কেউ বেঞ্চে বসেছে। আমার সামাজিক অবস্থা নিশ্চয়ই উপরের দিকে, কারণ আমাকে দেখে চেয়ারে বসে থাকা একজনকে তুলে দিয়ে আমাকে বসানোর চেষ্টা করা হলো– আমি অবশ্য তাতে রাজি হলাম না। সবার আপত্তির মাঝখানে আমি একটা বেঞ্চের এক কোনায় বসে পড়লাম।

কিছুক্ষণের মাঝে সালিশ শুরু হলো। আমি আগে কখনো গ্রাম্য সালিশ দেখি নি, তবে সালিশ যেহেতু এক ধরনের বিচার, আমার ধারণা ছিল যে দুই পক্ষের কথাবার্তাই শোনা হবে। কিন্তু আমি দেখতে পেলাম সেরকম কিছু হলো না, কাজেম আলী সালিশ প্রক্রিয়াটা শুরু করল মড়াকে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে সে মড়া কী কী করছে তার বর্ণনা দিতে শুরু করল। তার কথা শেষ হবার আগেই সব লোকজন হৈ হৈ করে মড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কিল ঘুষি লাথি মারতে থাকে। মড়ার চোখ খোলা থাকলে তার কু-দৃষ্টির ভয়ে কেউ নিশ্চয়ই তার গায়ে হাত তোলার সাহস পেত না। এখন কালো কাপড় দিয়ে চোখ বাঁধা, কারো ভয় নেই! সবাই নির্মমভাবে মারছে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে মানুষগুলোকে থামানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু কেউ আমার কথা শুনল না, আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে তারা মড়াকে মারতে থাকে। আমি এর আগে কখনো এরকম কিছু দেখি নি, যারা মারছে আলাদা আলাদাভাবে তাদের প্রত্যেকটা মানুষই হয়তো খুবই নিরীহ কিন্তু হঠাৎ করে সব নিরীহ মানুষগুলো মিলে একটা উন্মত্ত দল তৈরি হয়েছে, যেখানে কারো কোনো আলাদা অস্তিত্ব নেই, সবাই মিলে একটা হিংস্র প্রাণীর মতো, এই হিংস্র প্রাণীটাকে আমি আগে কখনো দেখি নি। এই হিংস্র প্রাণীটাকে কেমন করে থামাতে হয় আমি জানি না।

আমি তবু চেষ্টা করলাম, চিৎকার করে বললাম, "আপনারা থামেন। এভাবে মারবেন না– মানুষটার কিছু হয়ে গেলে আপনারা কিন্তু অনেক বড় বিপদে পড়বেন। পুরো গ্রামের মানুষকে কিন্তু পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে!"

মানুষেরা আমার কথা শুনল না, এক সময় লক্ষ করলাম কয়েকজন মানুষ আমাকে ধরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে– এরা কাজেম আলীর লোক। তারা ঠাণ্ডা মাথায় যে হত্যাকাণ্ড ঘটাতে চাইছে আমি সেখানে একটা উটকো ঝামেলা ছাড়া আর কিছু না। আমি চিৎকার করতে থাকলাম এবং তারা আমাকে টেনে সরিয়ে নিতে লাগল, একজন কানে ফিসফিস করে বলল, "স্যার! বেকুবি কইরেন না। পাবলিক

খেপেছে, মড়ারে শেষ করে আপনারে ধরবে!" পরিষ্কার আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা– আমি কিছুক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলাম। নিজেকে খুব অসহায় আর তুচ্ছ মনে হলো, একটা মানুষকে চোখের সামনে সবাই মিলে মেরে ফেলছে, আমি তাকে বাঁচাতে পারলাম না।

সন্ধেবেলা খবর পেলাম মড়াকে শেষ পর্যন্ত জানে মারে নি, তবে তার চোখ দুটো তুলে নেয়া হয়েছে। যে চোখের কু-দৃষ্টি দিয়ে সে গ্রামের শত শত মানুষের সর্বনাশ করেছে, শাস্তিটা সেই চোখের ওপর দিয়ে গিয়েছে। মড়া হয়তো বেঁচে থাকবে কিন্তু সে আর কোনো মানুষের ক্ষতি করতে পারবে না।

গভীর রাতে আমি মড়াকে দেখতে গেলাম, ভাঙা মন্দিরের কোনায় সে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে চোখ দুটো বাঁধা, সেই ন্যাকড়ায় ছোপ ছোপ রক্ত। বাঘা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে মড়ার চারপাশে ঘুরছে, আমাকে দেখে চাপা হুংকার না দিয়ে করুণ স্বরে একটু শব্দ করল। বোঝা যায় কুকুরটা চাইছে আমি তার মনিবের জন্যে কিছু করি। আমি ডাকলাম, "মড়া।"

মড়া দুর্বল গলায় বলল, "স্যার– আপনি আসছেন?"

আমি একটু কাছে গিয়ে বললাম, "মড়া, আমি খুবই দুঃখিত।"

মড়া বাধা দিয়ে বলল, "দুঃখিত হবার কিছু নাই স্যার। তবে আপনি এখানে আসবেন না। আপনার বিপদ হবে। আপনি যান।"

"কিন্তু তোমাকে তো হাসপাতালে নিতে হবে।"

মড়া হাসির মতো একটা শব্দ করল, বলল, "হাসপাতালে নিয়া কুনো লাভ নাই। আমার মতো মানুষের হাসপাতালে জায়গা নাই।"

"আছে। তুমি রেডি থাকো, আমি একটা রিকশা ভ্যান নিয়ে আসি।"

"স্যার!" মড়া ফিসফিস করে বলল, "আপনি মানুষটা বোকা কিসিমের! আমার জন্যে আপনি বিপদে পড়বেন। আমারে কোথাও নিতে পারবেন না। এইটা আমার ঘর। আমি এইখানে শুয়ে শুয়ে মরতে চাই! আপনি যান।"

"কিন্তু–"

"কোনো কিন্তু নাই। আপনি যান।"

আমি যখন চলে আসছি তখনো দেখি বাঘা কুকুরটা মড়াকে ঘিরে ছটফট করছে।

মড়াকে আবার আমি দেখতে গেলাম তিন-চার দিন পর। আমার পায়ের শব্দ শুনে সে উঠে বসল, এর আগের দিন ন্যাকড়া দিয়ে চোখ ঢাকা ছিল, আজকে

সেটি খোলা। চোখের গর্তে দগদগে ঘা দেখে শরীর শিউরে ওঠে। তার পাশে বাঘা বসে আছে, আমাকে এতদিনে চিনে গেছে, চাপা গর্জন না করে সে তার লেজ নাড়ল। মড়া বলল, "স্যার! আপনি আবার এসেছেন?"

"কেন? এসেছি তো কী হয়েছে!"

"আমি বলেছি আপনি বিপদে পড়বেন। আপনি আসবেন না।"

"ঠিক আছে। আর আসব না।"

মড়া চুপ করে বসে রইল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কেমন আছ?"

মড়া হাসির মতো শব্দ করে বলল, "আমি খুবই ভাল আছি। আগে এই খারাপ দুনিয়াটা দেখা লাগত এখন আর দেখা লাগে না।"

আমি এর উত্তরে কী বলব বুঝতে পারি না। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার শরীর কেমন আছে?"

"শরীরের বেদনাটা একটু কমছে। আগে মনে করছিলাম আর কুনোদিন উঠে দাঁড়াতে পারমু না। এখন মনে হচ্ছে পারমু।"

"ভাল।"

"জে না, ভাল না।"

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "কেন? ভাল না কেন?"

"আমি পিশাচ মানুষ। আমি যদি নিজের পায়ের উপর দাঁড়াই তাহলে সেইটা দুঃসংবাদ।" মড়া কথা শেষ করে দুলে দুলে হাসতে লাগল। এরকম পরিবেশে কেউ হাসতে পারে নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতাম না। তবে এটা আসলে হাসি নয়, এটা আনন্দহীন এক ধরনের প্রতিক্রিয়া।

আমি ছোট একটা ব্যাগে করে মড়ার জন্যে কিছু শুকনো খাবার, পানির বোতল, প্যারাসিটামল এরকম কিছু জিনিস নিয়ে গিয়েছিলাম, সেগুলো তাকে দিলাম। হাত দিয়ে সেগুলো অনুভব করে মড়া একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "স্যার। আপনারে একটা কথা বলি?"

"বলো।"

"খারাপ মানুষের পিছনে মায়া নষ্ট করবেন না।"

"ঠিক আছে। করব না।"

"আপনি সাদাসিধে মানুষ। আপনি আমার জন্যে বিপদে পড়বেন।"

"সেটা নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না।"

"আপনি হলেন বোকা কিসিমের মানুষ, কিন্তু আসলে বোকা মানুষ কে বলেন দেখি।"

"আমি জানি না।"

"সত্যিকারের বেকুব হলো কাজেম আলী।"

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "কেন? তুমি এরকম একটা কথা বলছ কেন?"

"তার কারণ সে আমারে জানে মারে নাই! খালি আমার চোখ দুইটা তুলে নিছে!" মড়া আবার দুলে দুলে তার আনন্দহীন হাসিটা হাসতে লাগল।

আমি মড়ার হাসি শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি এরকম কথা কেন বলছ?"

"কাজেম আলী আমারে জানে না মেরে খুব বড় বেকুবি করেছে! আমারে তার জানে মারা উচিত ছিল।"

"কেন?"

মড়া আমার কথার উত্তর না দিয়ে আবার দুলে দুলে হাসতে লাগল।

আমি যখন ভাঙা মন্দির থেকে বের হয়েছি তখন অন্ধকারের ভেতর থেকে দুইজন মানুষ বের হয়ে এলো, আমি কিছু বোঝার আগেই তারা আমাকে ধরে ফেলল। আমি নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম, পারলাম না। কেউ একজন পিছন থেকে আমার মাথার মাঝে কিছু একটা দিয়ে আঘাত করল, মুহূর্তের মাঝে চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায়। জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে আমার মনে হলো মড়া ঠিকই বলেছিল, আমি বিপদে পড়ব। আমি বিপদে পড়েছি। অনেক বড় বিপদে পড়েছি।

আমি কতক্ষণ অচেতন হয়ে ছিলাম জানি না, কেউ একজন মুখে পানির ঝাপটা দিয়ে আমার জ্ঞান ফিরিয়েছে। আমি যখন চোখ খুলে তাকালাম তখন দেখি আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে কাজেম আলী। আমাকে চোখ খুলতে দেখে কাজেম আলী উঠে গিয়ে একটা চেয়ারে পা তুলে বসল। তার হাতে একটা হাত পাখা, সে হাত পাখার ডাঁটিটা দিয়ে তার পিঠ চুলকাতে চুলকাতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "মিয়া সাহেবের জ্ঞান হয়েছে।"

আমি মাথা নাড়তে গিয়ে দেখি ঘাড়ে প্রচণ্ড ব্যথা। যন্ত্রণার একটা শব্দ করে আমি চারিদিকে তাকালাম। ঘরে আরো কিছু মানুষ, মানুষগুলোর চেহারা, ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যায় এরা সবাই ভয়ংকর মানুষ। কাজেম আলী ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "মিয়া সাহেবের মতলবটা কী? মড়ার সাথে আপনার এত পিরিত কিসের? ঐ পিচাশের কাছ থেকে কোনো কুফুরি কালাম শেখার খায়েশ হয়েছে নাকি?"

আমি কোনো কথা বললাম না, সে যেভাবে কথা বলেছে তার উত্তরে কিছু বলার কোনো অর্থ নাই। কাজেম আলী কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি আপনার ব্যাপারটা অনেক চিন্তা করেছি। কিছু কিছু মানুষ আছে খালি ঝামেলা করে। সোজা জিনিসরে ঘোঁট পাকায়। আপনি হচ্ছেন সেইরকম মানুষ। আপনার থাকার কথা ঢাকা শহরে। বড় বড় মানুষের সাথে বড় বড় কাজকর্ম করবেন। তা না করে আসছেন মুখ্যুসুখ্যু মানুষের গাঁও-গেরামে। এইখানে আপনার বড় বড় কামকাজের সুযোগ কই?"

মানুষটা কী বলে শোনার জন্যে আমি চুপ করে বসে রইলাম। কাজেম আলী ডান হাতের কেনে আঙুল দিয়ে কান চুলকাতে চুলকাতে বলল, "এখন বলেন আপনার মতলবটা কী? মড়ারে দিয়ে আপনি মামলা করাতে চান?"

"না। আমি কাউকে দিয়ে মামলা করাতে চাই না।"

"নিশ্চয়ই চাও!" কাজেম আলী হঠাৎ করে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে! দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "তা না হলে ঐ পিচাশের বাচ্চার সাথে দিন-রাত কী নিয়ে গুজুর গুজুর করো।"

"আমি কিছু নিয়ে গুজুর গুজুর করি না। একটা মানুষের উপর এত বড় অত্যাচার করা হয়েছে–"

আমার কথার মাঝখানে আমাকে থামিয়ে দিয়ে কাজেম আলী চিৎকার করে বলল, "মানুষ? মড়া একজন মানুষ?"

আমি বুঝতে পারলাম এই কথার প্রতিবাদ করে লাভ নেই। আমি তাই চুপ করে রইলাম। কাজেম আলী পা দাপিয়ে বলল, "বলো সত্যি কথা। তুমি কী মামলা করতে চাও?"

"না।"

"তাহলে কী নিয়ে কথা বলো মড়ার সাথে।"

আমি চুপ করে রইলাম। কাজেম আলী বলল, "আমার জন্যে সবচেয়ে সোজা কাজ কী জানো?"

"কী?"

"তোমারে কোথাও পুঁতে ফেলি। দুনিয়ার কেউ জানবে না তোমার কী হয়েছে। সব ঝামেলা চুকে যাবে তাহলে। তুমি কী চাও সেইটা করি?"

আমি কাজেম আলীর দিকে তাকালাম, বুঝতে পারলাম এই মানুষটা দরকার হলে সত্যিই আমাকে খুন করে পুঁতে ফেলবে। আমি কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলাম। কাজেম আলী হুংকার দিয়ে বলল, "চাও?"

আমার এই মানুষটার সাথে কথা বলতেই ঘেন্না হচ্ছিল, কিন্তু যদি চুপ করে থাকি তাহলে হয়তো সত্যিই আমাকে খুন করে ফেলবে। কী বলব বুঝতে পারছিলাম না ঠিক তখন একজন মানুষ কাজেম আলীর কাছে ছুটে এসে বলল, "হুজুর।"

"কী হয়েছে?"

"মড়া।"

"কী হয়েছে মড়ার?"

"মড়া আসছে।"

কাজেম আলী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "মড়া? মড়া আসছে?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন করে আসছে।"

"একটা কুত্তাকে দড়ি দিয়ে বেন্দে রেখেছে। সেই কুত্তার পিছে পিছে আসছে!"

কাজেম আলী অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "মড়া কোনদিকে আসছে।"

"মনে হয় এইদিকে।"

"এই দিকে? আমার বাড়িতে?"

"জে।"

কাজেম আলী কিছুক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে রইল, তারপর মেঘ গলায় বলল, "আমার বন্দুকটা বার কর।"

কাজেম আলীর একটা বন্দুকও আছে– আমার সেটা আগেই অনুমান করা উচিত ছিল। একজন কাজেম আলীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "মড়াকে আসতে দিমু না আটকামু।"

"আসতে দে।"

কাজেই সবাই মিলে মড়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। আমি নিজেও পা টেনে টেনে জানালার কাছে দাঁড়ালাম। জোছনার আলোতে দেখতে পেলাম বাঘার পিছু পিছু মড়া খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে।

কাজেম আলীর বাড়ির কাছাকাছি এসে মড়া দাঁড়াল। একজন তাকে জিজ্ঞেস করল, "মড়া। তুই কী চাস?"

"আমি কাজেম আলী হুজুরের সাথে দেখা করতে চাই।"

"কী জন্যে?"

"হুজুরের কাছে একটা কথা বলতে চাই।"

"কী কথা?"

"সেইটা আমি হুজুরের কাছে বলব। অন্য কাউরে বলব না"

কাজেম আলী বলল, "ঠিক আছে। মড়ারে আসতে দে। কুত্তাটা যেন সাথে না আনে।"

মড়া তখন বাঘাকে বাইরে রেখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভিতরে ঢুকল। তার দুই চোখের জায়গায় বীভৎস দুটি গর্ত দেখে গা শিউরে ওঠে। কাজেম আলী কোথায় দাঁড়িয়ে আছে অনুমান করে সেদিকে ঘুরে বলল, "হুজুর।"

কাজেম আলী বন্দুকটা ধরে রেখে বলল, "কী?"

"আপনারে একটা কথা বলতে এসেছি।"

"কী কথা?"

"শহর থেকে যে সাহেব এসেছেন, আপনি তারে ধরে এনেছেন?"

কাজেম আলী হুংকার দিয়ে বলল, "সেটা শুনে তুই কী করবি?"

"সেই স্যাররে আপনি যেতে দেন। সেই স্যার সোজা-সরল মানুষ। সে কিছু করে নাই।"

কাজেম আলী হুংকার দিয়ে বলল, "আমি কী তোর কথা শুনে কাজ করব?"

"হুজুর। আপনি আমার চোখ দুইটা তুলে নিয়েছেন। আমি সেইটা নিয়ে তো কোনো কথা বলি নাই। শহরের সোজা কিসিমের মানুষটার কথা বলতে এসেছি–"

কাজেম আলী হুংকার দিয়ে বলল, "চুপ কর। চুপ কর হারামির বাচ্চা।"

মড়াকে ধমক দেওয়ার সাথে সাথে একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটল, বাঘা হঠাৎ চাপা গর্জন করে লাফিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। মড়ার সামনে দাঁড়িয়ে সেটা কাজেম আলীর দিকে তাকিয়ে হিংস্র গলায় গর্জন করে ওঠে।

কাজেম আলী তার বন্দুকটা বাঘার দিকে তাক করে চিৎকার করে বলল, "বের হ ঘর থেকে। বের হ।"

বাঘা ঘর থেকে বের হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখাল না। কাজেম আলীর দিকে তাকিয়ে সেটা আবার হিংস্রভাবে চাপা গর্জন করে ওঠে। কাজেম আলী চাপা গলায় বলল, "মড়া! তুই তোর কুত্তারে ঘর থেকে বের কর, না হলে আমি কিন্তু গুলি করমু–"

মড়া হাত দিয়ে বাঘাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করল, স্পর্শ করা মাত্রই কিছু একটা ঘটে গেল। হঠাৎ সেটা বিদ্যুৎ গতিতে কাজেম আলীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলা কামড়ে ধরার চেষ্টা করল। কাজেম আলী হুমড়ি খেয়ে নিচে পড়ে যায়,

বিশাল আকৃতির বাঘা তার গলা কামড়ে টেনে ধরার জন্যে হুটোপুটি করতে থাকে। ঘরের ভেতর হৈচৈ-চিৎকার-হুটোপুটি শুরু হয়ে যায়। মেঝেতে পড়ে থাকা অবস্থায় কাজেম আলী তার বন্দুক দিয়ে গুলি করল– ঘরের ভেতর ছোট ঘরে সেই গুলির প্রচণ্ড শব্দে পুরো ঘর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে– আমি দেখলাম গুলি খেয়ে বাঘা শূন্যে ছিটকে উঠে নিচে পড়ে গেছে। ঘরের মানুষগুলো ছুটে এসে বাঘাকে পিটাতে থাকে। দেখতে দেখতে বিশাল কুকুরটা নেতিয়ে পড়ল।

মড়া চোখে কিছু দেখছে না, গুলির শব্দ চিৎকার হৈচৈ শুনে সব কিছু অনুমান করার চেষ্টা করছে। কিছু জিনিস অনুমান করতে পারছে, কিছু পারছে না। তার প্রিয় কুকুরটিকে মেরে ফেলা হয়েছে এটুকু শুধু বুঝতে পারে। সে হাতড়ে হাতড়ে বাঘার শরীরটাকে খুঁজে বের করে সেটাকে জাপটে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। আমার মনে পড়ল কয়দিন আগে সে আমাকে বলেছিল এই বাঘাই তার সন্তান, এই বাঘাই তার পরিবার– এখন তার আর কেউ নেই। শুধুমাত্র অন্যরকম হয়ে জন্ম নেবার জন্যে তাকে কী পরিমাণ অবিচার সহ্য করতে হলো!

গ্রাম দেশে গুলির শব্দ খুবই বিপজ্জনক শব্দ। ডাকাত পড়েছে মনে করে কিছুক্ষণের মাঝেই লাঠিসোঠা নিয়ে পুরো গ্রামের মানুষ কাজেম আলীর বাসা ঘিরে ফেলল। তারা এসে যেটা দেখছে সেটা ডাকাতির মতোই চমকপ্রদ– গুলি খাওয়া মৃত বিশাল একটা কুকুরের উপর শুয়ে মড়া হাউমাউ করে কাঁদছে। মানুষ ভিড় করে দৃশ্যটা দেখতে থাকে।

এত কিছু হওয়ার কারণে আমার একটা লাভ হলো, আমি ছাড়া পেয়ে গেলাম। কেউ মড়ার কাছে যাওয়ার সাহস পাচ্ছিল না, আমি গিয়ে তাকে ধরে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। এর আগে আমি তাকে কখনো স্পর্শ করি নি, স্পর্শ করার সাথে সাথে আমি চমকে উঠি, তার শরীরটা আশ্চর্য রকম শীতল, যেন এটি জীবন্ত কোনো মানুষ নয়, যেন এটি একজন মৃত মানুষ। নিজের বিস্ময়টুকু গোপন করে আমি বললাম, "মড়া। তুমি উঠে এসো– তোমার হাসপাতালে যাওয়া দরকার– তোমার যে অবস্থা তুমি বাঁচবে না।"

গ্রামের মানুষদের বোঝা খুব মুশকিল, যারা মাত্র কয়েকদিন আগে খুবলে খুবলে এই মানুষটার দুই চোখ তুলে ফেলেছে তারাই এখন হঠাৎ করে মড়াকে হাসপাতালে নেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তারা ছোটাছুটি করে একটা রিকশা ভ্যান নিয়ে আসে। গভীর রাতে একটা রিকশাভ্যানে মড়াকে তুলে যখন হাসপাতালে রওনা দিয়েছি তখন হঠাৎ মড়ার সারা শরীরে এক ধরনের খিঁচুনি শুরু

হলো, তার শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে। খকখক করে সে কয়েকবার কাশতে কাশতে বমি করে দিল, আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম সে নিশ্বাস নিতে পারছে না। অনেক কষ্ট করে সে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করে, বুকের ভেতর ঘরঘর করে শব্দ হয় কিন্তু দেখে মনে হয় বুকের ভেতর কোনো বাতাস ঢুকছে না। বার কয়েক খিঁচুনি দিয়ে হঠাৎ করে তার শরীরটা একেবারে স্থির হয়ে গেল।

অনেক মানুষের ভিড়, তার মাঝে একজন বলল, "মরে গেছে।"

সাথে সাথে সবাই কয়েক পা পিছিয়ে যায়। এই গ্রামের মানুষ জ্যান্ত মড়াকে যেটুকু ভয় পায় তার থেকে অনেক বেশি ভয় পায় মৃত মড়াকে। আমি গিয়ে মড়ার হাত ধরলাম। নাড়ির স্পন্দন নেই, বুকে হাত দিয়ে দেখলাম হৃৎস্পন্দন থেমে গেছে। নিশ্বাস আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। আমি ডাক্তার না, তবু বুঝতে কোনো সমস্যা হলো না যে মানুষটা মরে গেছে। এই দুর্ভাগা মানুষটার জন্যে আমি এক ধরনের কষ্ট অনুভব করতে থাকি।

কাজেম আলী আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, জিজ্ঞেস করল, "মরে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

মুহূর্তে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে ভয় পাওয়া গলায় বলল, "সর্বনাশ।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "হ্যাঁ। আসলেই সর্বনাশ। খুন করে রাত্রের অন্ধকারে চরে পুঁতে ফেললে কেউ জানত না। এখন সবাই জানে। এই গ্রামের সব মানুষের সামনে মারা গেছে। সকালবেলা পুলিশ আসবে। দেখবে আপনি একটা মানুষের চোখ তুলে নিয়েছেন– আপনার অত্যাচারে মানুষটা মরে গেছে।"

"আমি– আমি– আমি–" কাজেম আলী তোতলাতে থাকে। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, "মড়া নামের এই মানুষটা মরে গেছে। কিন্তু এই মানুষটার জন্যে আমি জানে বেঁচে গেছি। সে যদি না আসত– আপনি এতক্ষণে আমাকেও খুন করে কোথাও পুঁতে ফেলতেন!"

কাজেম আলী আবার কিছু একটা বলার চেষ্টা করল, "কী বলছেন আপনি? আমি আপনাকে খুন করব–"

"হ্যাঁ। আমাকে ধরে এনেছেন। একটু আগে নিজের মুখে বলেছেন– আমাকে খুন করে পুঁতে ফেলবেন! মনে আছে?"

কাজেম আলী আবার কিছু একটা বলার চেষ্টা করে, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। আমি শরীরে আর শক্তি পাচ্ছিলাম না। গ্রামের মানুষগুলোকে মড়ার মৃতদেহটি দেখিয়ে বললাম, "এইখানে অনেক বড় একটা অবিচার হয়েছে।

আপনারা এই গ্রামে এই অবিচারটা হতে দিয়েছেন। আল্লাহ যেন আপনাদের মাফ করে দেয়।"

গ্রামের কিছু মানুষ বিড়বিড় করে কিছু কথা বলল, আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারল বলে মনে হয় না। মড়া মারা গিয়েছে সেই ব্যাপারটি এখনো তারা ধরতে পেরেছে বলে মনে হয় না– তাদের কাছে মনে হচ্ছে এটার অন্য কোনো অর্থ আছে!

আমি যখন নিজের বাসায় ফিরে এসেছি তখন রাত একটা বাজে। বাসায় মফিজ নেই, গ্রামে থাকতে গিয়ে তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই সে শহরে গিয়ে রাত কাটায়। আজকেও শহরে গেছে, কখন আসবে কেউ জানি না।

আমি টিউবওয়েল থেকে পানি বের করে সেই ঠাণ্ডা পানি দিয়ে অনেকক্ষণ শরীর রগড়ে রগড়ে গোসল করলাম। রাতে কিছু খাওয়া হয় নি, খুব খিদে লেগেছে কিন্তু বিচিত্র একটা কারণে কিছু খাওয়ার ইচ্ছে করছে না। কিছুতেই চোখের সামনে থেকে মড়ার বীভৎস মৃতদেহের দৃশ্যটি সরাতে পারছিলাম না।

কাদের রান্না করে রাতের খাবারটা টেবিলে ঢেকে রেখেছে। এতক্ষণে সেগুলো বরফের মতো ঠাণ্ডা, আমি গরম না হলে একেবারে খেতে পারি না। এখন খাবারটা গরম করব নাকি ঠাণ্ডাই খেয়ে ফেলব নাকি খাবই না– ঠিক করতে পারছিলাম না তখন হঠাৎ করে দরজায় শব্দ হলো। ভীত-আতংকিত মানুষের অস্থির এক ধরনের শব্দ। এত রাতে কে হতে পারে আমি বুঝতে পারছিলাম না। হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে দরজা খুলতেই কাজেম আলী হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়ে! তার মুখে এক ধরনের অবর্ণনীয় আতংক। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মাঝে তার বয়সটা দশ বৎসর বেড়ে গিয়েছে। সাথে আরো দু'জন মানুষ, তারা আতংকিত চোখে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে। কাজেম আলী ঘরে ঢোকার সাথে সাথে তারা ছুটতে ছুটতে পালিয়ে গেল।

কাজেম আলী ভিতরে ঢুকেই জাপটে আমার পা ধরে ফেলল, হাউমাউ করে চিৎকার করে বলল, "আপনি আমারে বাঁচান!"

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বয়স্ক একজন মানুষ জাপটে পা ধরে ফেললে খুব অস্বস্তি হয়, তাকে টেনে দাঁড়া করিয়ে বললাম, "কী হয়েছে?"

মানুষটা ভীত চোখে দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, "মড়া!"

"কী হয়েছে মড়ার?"

"মড়া আমাকে মেরে ফেলবে।"

"মড়া নিজেই মরে গেছে, আপনাকে কেমন করে মারবে?"

"মড়া পারে! মড়া মানুষ না, পিচাশ-"

কথা বলতে বলতে সে বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছিল। তাকে দেখে মনে হলো কেউ বুঝি এক্ষুনি দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে যাবে। আমি তাকে আশ্বস্ত করার জন্যে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। কাজেম আলী একটা চেয়ারে বসে কুলকুল করে ঘামতে থাকে। সে ঠিকভাবে কথা বলতে পারছে না, মনে হলো কী বলছে সেটাও সে নিজে ভাল করে বুঝতে পারছে না।

বেশ খানিকক্ষণ চেষ্টা করে আমি তার কাছ থেকে যেটা বুঝতে পারলাম সেটা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আতংকিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। কাজেম আলী বলল, আমি চলে যাবার সাথে সাথে অন্য সবাই চলে গেছে, কেউই পুলিশের ঝামেলায় পড়তে চায় না। একটু পরেই কাজেম আলী আবিষ্কার করল একেবারে নিজের বিশ্বস্ত দুই একজন মানুষ ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। রিকশা ভ্যানে মড়ার লাশ পড়ে আছে, সেটারও একটা ব্যবস্থা করতে হয়। বাংলাঘরে একটা চাটাই বিছিয়ে সেখানে মড়ার লাশটা টেনে নেবার সময় হঠাৎ করে মনে হলো কিছু প্রাণী গোঙানোর মতো শব্দ করতে করতে আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, প্রাণীগুলো মানুষের মতো কিন্তু ঠিক মানুষ নয় এইটুকু শুধু বোঝা যায়।

কাজেম আলী এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাবার সময় সেই প্রাণীগুলোও ঘরের বাইরে ছোটাছুটি করে, গোঙানোর মতো শব্দ করে। কাজেম আলী দু'জন মানুষকে অনেক কষ্ট করে রাজি করিয়ে আমার কাছে চলে এসেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমার কাছে কেন?"

কাজেম আলী খপ করে আমার হাত ধরে ফেলে বলল, "শুধু আপনি আমাকে বাঁচাতে পারবেন!"

"আমি?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "আমি কীভাবে বাঁচাব?"

"এই সারা গ্রামে শুধু আপনার সাথে মড়ার একটা সম্পর্ক ছিল! মড়া আপনার কথা শুনবে।"

"মড়া মরে গেছে! আপনি রিকশা ভ্যানের ওপর থেকে সরিয়ে বাংলাঘরে চাটাইয়ের ওপর তাকে শুইয়ে এসেছেন!"

"মড়া মরে না। সে জিন্দা লাশ। এখন সে আমারে শাস্তি দিতে আসছে-" কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে কাজেম আলী থেমে গিয়ে বলল, "ঐ যে শুনেন!"

আমি কিছু শুনতে পেলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, "কী শুনব?"

কাজেম আলী ফ্যাকাসে মুখে বলল, "আসছে!"

আমি কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম, সত্যি সত্যি গোঙানোর মতো এক ধরনের শব্দ ভেসে আসছে। অনেক যন্ত্রণার সময় কেউ যখন কাতর শব্দ করে অনেকটা সেরকম।

কাজেম আলী আমার হাত ধরে বলল, "আমাকে বাঁচান।"

আমি ঠিক কীভাবে তাঁকে বাঁচাব বুঝতে পারছিলাম না। কান পেতে শুনতে পেলাম কিছু একটা আসছে। কোনো একটা প্রাণীর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, প্রতি পদক্ষেপে সেই গোঙানোর মতো শব্দটা বেড়ে যাচ্ছে। আমি নিজের ভেতর অশরীরী এক ধরনের আতংক অনুভব করতে থাকি।

হঠাৎ করে ঘরের ভেতর থপ করে কিছু একটা পড়ল– রক্তাক্ত কিছু নাড়িভুঁড়ির মতো মনে হলো। কোথা থেকে এটা এসেছে বুঝতে পারলাম না। মনে হয় জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে। বিকট একটা দুর্গন্ধে ঘরটা ভারী হয়ে যায়। জানালাটা খোলা ছিল, সেখানে একটা কুৎসিত মুখ মুহূর্তের জন্য উঁকি দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। গোঙানোর মতো শব্দটা এখন দরজার সামনে থেকে আসছে। শুনতে পেলাম দরজাটাতে কিছু একটা ধাক্কা দিচ্ছে। প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর জোরে– তারপর আরো জোরে।

কাজেম আলী আমার পায়ের উপর পড়ে মাথা কুটতে থাকে, "বাঁচান! আমাকে বাঁচান।"

দরজাটাকে ধাক্কা দিতে দিতে হঠাৎ ছিটকানি খুলে গেল– বিচিত্র একটা প্রাণী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কালো লোমশ দেহ, রক্তে মাখামাখি। ক্ষত-বিক্ষত শরীর থেকে হাড়গোর বের হয়ে আছে। প্রাণীটা দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, নিচে পড়ে গেল। নিচে পড়েও থেমে গেল না, শরীর ঘষে ঘষে এগিয়ে আসতে থাকে, তখন তাকে আমি চিনতে পারলাম, এটা মড়ার কুকুর বাঘা। গুলিতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। এটি জীবন্ত নয়, মৃত কিন্তু তারপরেও এটা নড়ছে, এগিয়ে আসছে।

আমি কিছু বোঝার আগেই বাঘা– কিংবা বাঘার দেহ কাজেম আলীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাজেম আলীর ভয়ংকর চিৎকার শুনতে পেলাম, আমি একটা ধাক্কা খেয়ে এক পাশে ছিটকে পড়েছি, হাত থেকে হ্যারিকেনটা পড়ে গিয়ে নিভে গিয়েছে। ঘরের ভেতর ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার মাঝে এক ধরনের হুটোপুটি,

কাজেম আলীর আর্তনাদ, সবকিছু ছাপিয়ে হিংস্র একটা পশুর চিৎকার। আমার মনে হলো আমি বুঝি নরকের ভেতর আটকে গেছি।

গল্পের এই জায়গায় আবেদ হাসান একটু থামলেন। আমি বুক থেকে আটকে থাকা নিশ্বাসটা বের করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কাজেম আলীকে মেরে ফেলল?"

"না।" আবিদ হাসান মাথা নাড়লেন, "মেরে ফেলে নি। শুধু চোখ দুটো খুবলে তুলে নিয়েছে।"

"কী ভয়ংকর!"

"হ্যাঁ। খুবই ভয়ংকর। আমার জীবনে এরকম ঘটনা আমি কখনো দেখি নি।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "কেউ যদি এই গল্প বিশ্বাস করতে না চায় তাকে খুব একটা দোষ দেয়া যায় না।"

আবিদ হাসান বললেন, "উঁহু। গল্পের এইটুকু ঠিক আছে। এর পরের অংশটুকু কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।

"কী আছে পরের অংশে?"

"মড়ার অংশটুকু।"

"কী হয়েছে মড়ার?"

"সকালবেলা গিয়ে দেখি মড়ার লাশ নেই।"

"কী হয়েছে মড়ার লাশের?"

"কেউ ঠিক করে জানে না, তবে সবার ধারণা হেঁটে চলে গেছে।"

আমি চোখ বড় বড় করে বললাম, "হেঁটে চলে গেছে? মৃতদেহ হেঁটে চলে গেছে!"

"না। মৃতদেহ হেঁটে যায় নি। জীবন্ত দেহই হেঁটে গেছে।"

"জীবন্ত দেহ? আপনি না বললেন মরে গেছে?"

আবিদ হাসান মাথা চুলকে বলল, "বলেছিলাম। কারণ আমাদের প্রচলিত বিশ্বাসে সেটাই ছিল মরে যাওয়া। কিন্তু মড়ার মতো মানুষ– কিংবা যদি বলেন– পিশাচেরা নাকি শরীর থেকে তাদের আত্মা বের করে অন্য কোনো মৃতদেহে ঢুকে যেতে পারে। মড়া ঢুকেছিল বাঘার শরীরে। কাজ শেষ করে আবার নিজের শরীরে ফিরে এসে তার শরীর নিয়ে হেঁটে চলে গেছে।

আমি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আবিদ হাসানের দিকে তাকালাম। আবিদ হাসান দুই হাত তুলে বলল, "এট আমার থিওরি না। এটা ঐ গ্রামের মানুষের থিওরি!"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মড়াকে আর কখনো দেখা যায় নি?"

"না। গ্রামের মানুষ আর কখনো মড়াকে দেখে নি। তবে–"

"তবে কী?"

"গভীর রাতে বাঘাকে অনেকে দেখেছে। ক্ষত-বিক্ষত ছিন্নভিন্ন দেহ নিয়ে গোঙাতে গোঙাতে হাঁটছে।"

"তাহলে–"

আবিদ হাসান হাত তুলে বলল, "আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আমার কাছে কোনো ব্যাখ্যা নেই!"

আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। সবকিছুর ব্যাখ্যা থাকতে হবে কে বলেছে?

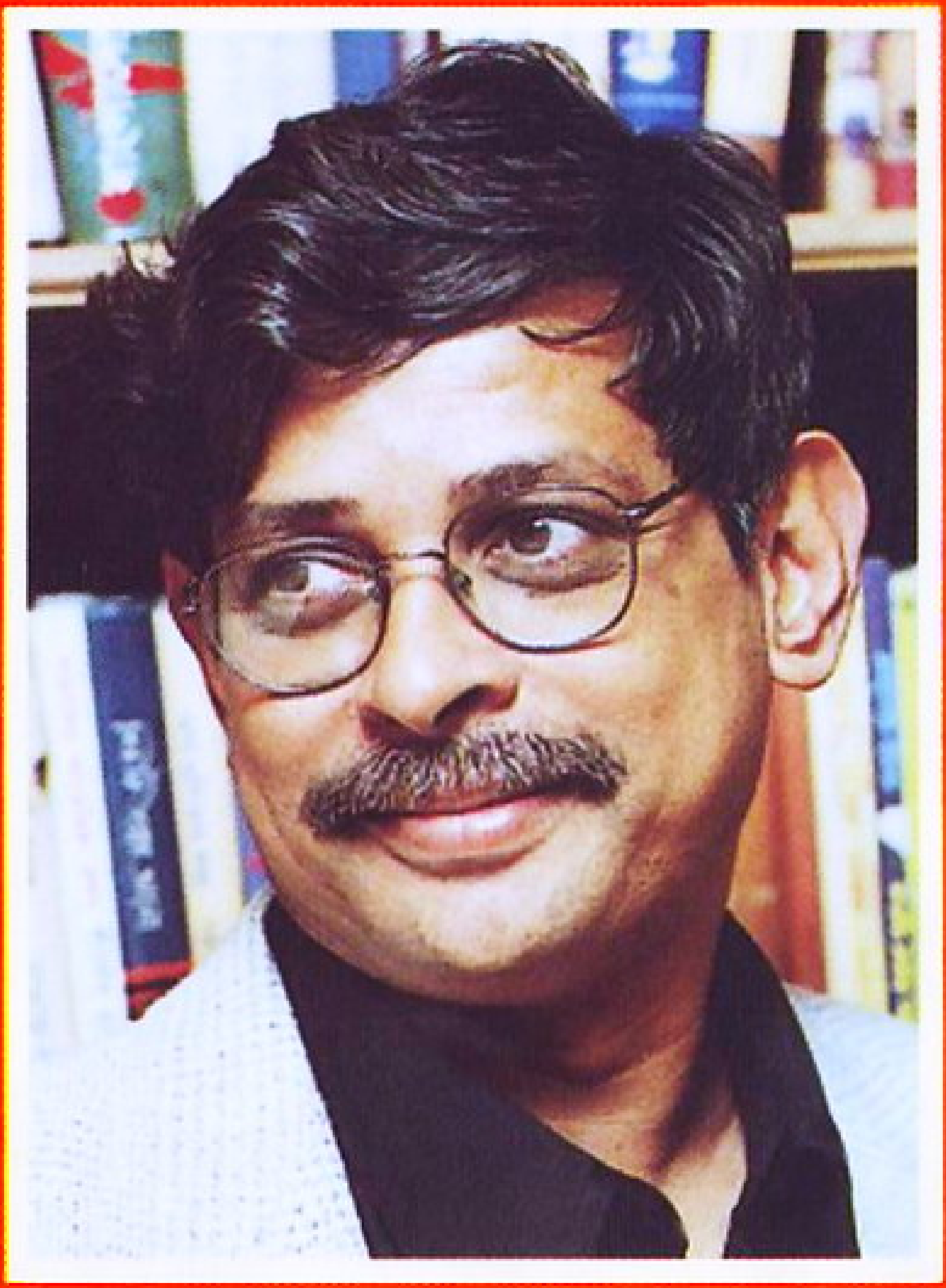

জন্ম : ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, পিএইচডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে সুদীর্ঘ আঠার বছর পর দেশে ফিরে এসে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে।

তাঁর স্ত্রীর ড. ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।

পাঠকনন্দিত এই লেখক ২০০৪ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন।